টোরাদ্বীপের ভয়ংকর

শক্তিপদ রাজগুরু

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন—১৩৬৪

প্রচ্ছদশিল্পী : রণেন মুখোপাধ্যায়

মুদ্রাকর : শ্রীসরোজকুমার রায়
শ্রীমুদ্রণালয়
১২, বিনোদসাহা লেন,
কলিকাতা—৬

স্নেহের মীরাকে

এই লেখকের ছোটদের বই :

নিঝুমরাতের আতঙ্ক
বনের আসর
টোয়াদ্বীপের ভয়ংকর

টোরাদ্বীপের ভয়ংকর

টোরাদ্বীপের ভয়ংকর

এক

ফোনে দশাবতার

কাজের সময় কোন ফোন বাজলে বড্ড বিরক্ত লাগে। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার অফিসে বসে খুব মন দিয়ে বিদ্যুৎমন্ত্রীর ভাষণ লিখছি, কাল সকালের কাগজে যেটা পড়ে লোকেরা এই ভয়াবহ বিদ্যুৎ সঙ্কটের অন্ধকারে অন্তত আশার আলোটি দেখতে পাবে—এমন সময় ফোন বাজল ক্রিরিরিবিরিং···

খাপ্পা হয়ে ফোন তুলেই বললুম—স্পেশাল রিপোর্টার জয়ন্ত চৌধুরীকে চাই তো? নেই। ছুটিতে গেছে।

—ডার্লিং, অবতার কাকে বলে জানো কি?

অপ্রস্তুত ও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। তারপর বললুম—খুব জানি। পাপীতাপী উদ্ধারে ভগবান নানারূপে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। সেই রূপের নাম অবতার। ইদানীংকালে যেমন এক অবতার কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। রাজ্যের চোর ডাকাত খুনীর হাত থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। তো হে গোয়েন্দারূপী অবতার মশাই! হঠাৎ এই সন্ধ্যাবেলায় অবতার নিয়ে জ্বালাতন কেন?

মাইডিয়ার ইয়ংম্যান! কারণ ছাড়া কার্য হয় না।

—ভাল কথা। বেশি বকবক না করে সোজা সেই কারণটা জানিয়ে দিন। আমার হাতে জরুরী কাজ রয়েছে। তাছাড়া আপনার জানা উচিত, এই সন্ধ্যাবেলাটাই হলো গিয়ে খবরের কাগজের পিক আওয়ার্স। সারাদিনের সব ঘটনার খবর এখন বন্যার মতো এসে টেবিল ডুবিয়ে দিয়েছে। অতএব···

—জয়ন্ত, জয়ন্ত! এ বৃদ্ধ সবই অবগত।

—তাহলে কাজে বাগড়া দিচ্ছেন কেন?

—হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো!

—শুনছি, বলুন।

—তোমার কলম চালনার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কলম থামিয়ে মন দিয়ে শোন।

—জ্বালাতন! কাগজ থেকে ফোনের দূরত্ব অন্তত হাফমিটার। আপনার কি পাঁচটি কান আছে?

—না। কিন্তু তুমি লেখার সময় কাগজের ওপর মুখটা ঝুঁকিয়ে রাখো দেখছি। এখনও তাই রেখেছো। লেখা বন্ধ করে হাসতে হাসতে বললুম—বেশ। এবার বলুন আপনার অবতার তত্ত্বটা কী?

—ডার্লিং, অবতারের সংখ্যা কত এবং কী তাদের নাম নিশ্চয় জানো?

—হুঁউ। দশ অবতার। যথাঃ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামন, নৃসিংহ ··

—এনাফ জয়ন্ত, এনাফ! আমার বক্তব্য শুধু নৃসিংহ সম্পর্কে। তুমি কাহিনীটা নিশ্চয়ই জানো?

—খুউব জানি। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু কৃষ্ণভক্ত বালক প্রহ্লাদকে বললেন, কোথায় থাকে তোমার কৃষ্ণ? প্রহ্লাদ বলল, সর্বত্র। দৈত্যরাজ বললেন, তাহলে এই স্তম্ভেও আছে সে? প্রহ্লাদ বলল, নিশ্চয় আছেন। তখন দৈত্যরাজ স্তম্ভের গায়ে মুদ্গরের আঘাত করলেন, আর স্তম্ভ বিদীর্ণ হয়ে নৃসিংহ মূর্তির আবির্ভাব ঘটল। বড় ভয়ঙ্কর সেই মূর্তি। অর্ধেক সিংহ, অর্ধেক মানুষ।

—খাসা! অর্ধেক সিংহ, অর্ধেক মানুষ!

—কর্নেল, আসলে এই অবতারের ব্যাপারটা ডারউইন সাহেবের সেই থিওরি অফ এভোল্যুশান, অভিব্যক্তিবাদ। নানান প্রাণী থেকে আকার বদলাতে বদলাতে শেষে বাঁদর জাতীয় প্রাণী থেকে মানুষের

উৎপত্তি। আমাদের ভারতীয় ঋষিরা কিন্তু সায়েবদের চেয়ে চার হাজার বছর আগেই ব্যাপারটা জানতেন। সেটাই অবতারতত্ত্বের মধ্যে ঠারেঠোরে বলেছেন। দেখুন না—গোড়ার অবতাররা নিছক প্রাণী। তারপর আদ্ধেক প্রাণী, আদ্ধেক মানুষ। শেষের অবতাররা খাঁটি মানুষ।

—এই অভিনব ব্যাখ্যা শুনে চমৎকৃত হলুম, বৎস! কিন্তু ব্যাখ্যাটি তোমার নিজস্ব কি?

—মোটেও না। প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ ডঃ হরিহর গড়গড়ির কাছে শুনেছি।

—কী অপূর্ব যোগাযোগ! ডার্লিং, ডঃ গড়গড়ি এখন আমার পাশেই বসে আছেন।

—তাই বলুন! সেই তো ভাবছিলুম, আপনার মাথায় খুলির ভেতরকার নরম বস্তুটিতে হঠাৎ মৎস্য-কূর্ম-বরাহ-নৃসিংহ-বামনরা হঠাৎ কিলবিল করে ঢুকে পড়ল কীভাবে? হাই ওল্ড ম্যান! যদি মঙ্গল চান, ওঁকে বিদেয় করুন। নৈলে শীগগির আপনাকে লুম্বিনী পার্ক, কিংবা গোবরা, কিংবা সেই রাঁচি দৌড়ুতে হবে। খবর এসেছে, সব বেডে পেসেণ্ট ভর্তি। সাবধান!

—হাঃ হাঃ হাঃ!

—হাসবেন না। একবার আমি ডঃ গড়গড়ির বক্তৃতা শোনার পর সত্যি হাফ পাগল হয়ে গিয়েছিলুম!

—চুপ, চুপ! আমার ফোন খুব সেন্সিটিভ। অন্যেরাও শুনতে পায়।

—যাক্ গে। যথেষ্ট হলো। এবার ছাড়ি। এক্ষুনি প্রেসে কপি পাঠাতে হবে।

—জয়ন্ত, তুমি ইউনিকর্ন নামে কোনও প্রাণীর কথা শুনেছ?

—হে বৃদ্ধ ঘুঘু! সত্যি আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন।

—প্রাচীন গ্রীক ও রোমান পুঁথিতে ইউনিকর্নের কথা আছে।

এ প্রাণী একটা শিংওলা ঘোড়ার মতো। এই প্রাণী নাকি ভারতে ছিল। তাছাড়া বাইবেলেও এমনি সব বিদ্‌ঘুটে জন্তুর কথা আছে। কিন্তু নৃসিংহ সত্যি অভিনব। আদিম পৃথিবীতে টেরাডাকটিল, ডাইনোসারস ইত্যাদি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর কথা বিজ্ঞানীরা বলেছেন। তারা কবে লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন কথা হচ্ছে, নৃসিংহরূপী কোনও প্রাণী যদি নিছক কল্পনা না হয়, তাহলে বলতে হবে যে এই প্রাণী ডাইনোসারসদের পরবর্তী যুগে দেখা দিয়েছিল। এমন কি, মানুষ অর্থাৎ হোমোসেপিয়েন প্রাণীদের আবির্ভাবের পরেও দু'চারটে নৃসিংহ টিকে গিয়েছিল। নৃসিংহ অবতারের গল্পে তারই আভাস রয়েছে।

—সর্বনাশ! ডঃ গড়গড়ি আপনার মাথাটি খেয়েছেন।

—জয়ন্ত, ধরো যদি এমন হয়, বর্তমান যুগেও কোথাও কোনও দুর্গম জায়গায় নৃসিংহ নামক জীব টিকে রয়েছে?

—থাকলে খুব ভাল হয় নিশ্চয়। দৈনিক সত্যসেবক সে-খবর ছেপে হইচই ফেলে দেয়। তবে ফোটো চাই। নৈলে লোকে গুলতাপ্পি বলে উড়িয়ে দেবে। ইয়েতি-টিয়েতি নিয়ে অনেক দেখা গেল না?

—ডার্লিং, তবে শোন! আমার কাছে নৃসিংহের ফোটো রয়েছে।

—এ্যাঁ!

—এ্যাঁ নয় বৎস, হ্যাঁ।

—নিশ্চয় ডঃ গড়গড়ি এনেছেন আপনার কাছে?

—দ্যাটস রাইট।

—ফোটোটা যে ক্যামেরার কারিকুরি নয়, তার প্রমাণ কী? ডঃ গড়গড়ি কোথায় দেখলেন নৃসিংহ?

—টোরা আইল্যাণ্ডে। আন্দামান থেকে একশো সাঁইত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণে একটা ছোট্ট দ্বীপে গিয়েছিলেন সম্প্রতি।

—একা ?

—মোটেই না। পাঁচজনের একটা বিজ্ঞানী টিম ভারত সরকার ওই এলাকায় পাঠিয়েছিলেন। একজন পুরাতত্ত্ববিদ—ডঃ গড়গড়ি, একজন ভূতত্ত্ববিদ—ডঃ গজরাজ মালহোত্র, একজন প্রাণীবিজ্ঞানী—ডঃ মুজঃফর আমেদ, একজন নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিত—ডঃ রঘুনাথ সিং এবং প্রখ্যাত জার্মান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডঃ গুটেনবার্গ।

—কর্নেল, কর্নেল! আমি এখনই যাচ্ছি। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে ফোন নামিয়ে রাখলুম।

দুই

নৃসিংহাবতারের অন্তর্ধান

ইলিয়ট রোডে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ফ্ল্যাটটি পুলিশ ও চেনাজানামহলে 'বুড়ো ঘুঘুর বাসা' নামে পরিচিত। তেতলাব এই ফ্ল্যাটটি যেন দিনে দিনে একটি ল্যাবরেটরী হয়ে উঠছে। কর্নেল বুড়ো রাজ্যেব পোকামাকড় নিয়ে কী সব গবেষণা করেন এবং মাঝে মাঝে বিদেশী পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। ইদানীং গোয়েন্দা-গিরির দিকে আর তত মনোযোগ নেই।

সেই শীতের সন্ধ্যায় 'বুড়ো ঘুঘুর বাসায়' ঢোকার আগে টের পাইনি যে টোরাদ্বীপে নৃসিংহ নামক প্রাণীর খবর শুধু নয়, আরও সাংঘাতিক খবর আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

ভারত সরকার টোরাদ্বীপে নানা বিষয়ে খোঁজ খবরের জন্য যে পাঁচজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন, নৃসিংহের কবলে পড়ে তাঁদের তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। বেঁচে অক্ষত দেহে ফিরতে পেরেছেন শুধু ডঃ হরিহর গড়গাড় এবং ডঃ গুটেনবার্গ। তবে ডঃ গুটেনবার্গের শরীর একেবারে অক্ষত নেই। কিছু আঁচড়ের দাগ নিয়ে

ফিরেছেন। নার্সিং হোমে চিকিৎসার পর সেরে উঠেছেন তিনি।

কিন্তু এতবড় একটা ঘটনা এখনও গোপন রাখা হয়েছে 'জাতীয় স্বার্থে'। তাই শেষ পর্যন্ত নিরাশ হলুম। কর্নেল বললেন—হুঁ একটা দিন ধৈর্য ধরো, জয়ন্ত। এমন সাংঘাতিক খবর চেপে রাখা যাবে না, সেটা সরকার ভালই জানেন। যথাসময়ে সাংবাদিকদের দিল্লিতে ডেকে কর্তৃপক্ষ ঘটনাটা জানাবেন। তখন তোমাদের সত্য-সেবক পত্রিকাও তা বিশদ ছাপতে পারবে। তবে কথা দিচ্ছি, ঠিক তার আগের দিন তুমি স্কুপ নিউজ হিসেবে 'বিশ্বস্তসূত্রে' একটুখানি যাতে ছেপে দিতে পার, তার ব্যবস্থা করব। সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু! নৈলে আমি ঝামেলায় পড়ব।

খুশি হয়ে বললুম—তাতেই চলবে। কিন্তু তার সঙ্গে ছবিটা ছাপলে ক্ষতি কী?

কর্নেল হেসে বললেন—তাহলে আর্কেওলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর ডঃ হরিহর গড়গড়ি বিপদে পড়বেন।

ডঃ গড়গড়ি জোরে মাথা নেড়ে বললেন—না জয়ন্তবাবু, ছবিটবি আমি ছাপতে দিতে পারব না।

ছবিটা দেখে শিউরে উঠতে হয়। ক্লোজ শটে তোলা ফোটো। ডঃ গুটেনবার্গ প্রাণের তোয়াক্কা না করে কী দুঃসাহসে যে জন্তুটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্যামেরার শাটার টিপে পালিয়ে গিয়েছিলেন, শুনে রক্ত হিম হয়ে যায়।

ডঃ গড়গড়ি আগাগোড়া খুলে কিছু বললেন না। কর্নেলও যেন ওর মুখ চেয়ে বেশি কিছু জানালেন না। তখন ভাবলুম, ডঃ গড়গড়ি চলে গেলে কর্নেলের কাছে পুরো আদ্যোপান্ত জেনে নেব।

কিছুক্ষণ একথা-ওকথার পর ডঃ গড়গড়ি চলে গেলেন। তখন কর্নেলকে বাগে পেয়ে বললুম—হাই ওল্ডম্যান! ডঃ গড়গড়ি আপনার দ্বারস্থ হলেন কেন খুলে বলুন তো?

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার রিঙ পাকিয়ে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে।

এক মিনিট পরে টাকে হাত বুলোলেন। তার এক মিনিট পরে সাদা দাড়ি খামচে ধরলেন। তারপর একটু হেসে আমার চোখে চোখ রেখে বললেন—টোরা আইল্যাণ্ডে যাবার ইচ্ছে আছে, জয়ন্ত ?

চমকে উঠলুম।—ওরে বাবা! নৃসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবেন ভাবছেন নাকি ?

—ক্ষতি কী ?

—কর্নেল, ভুলে যাবেন না, আপনি পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো মানুষ। আর দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ছিলেন রীতিমতো পালোয়ান। নৃসিংহের পাল্লায় পড়ে তাঁর প্রাণটি বেঘোরে গিয়েছিল।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—তবে সে-নৃসিংহ ছিল সত্যযুগে স্বয়ং ভগবানের অবতার। আর এ নৃসিংহ কলিযুগের নিছক প্রাণী বলেই অনুমান করছি। নৈলে জনপ্রাণীহীন টোরাদ্বীপে তার আবির্ভাবের অর্থ কী ? কাদের উদ্ধারে সেখানে ভগবান অবতীর্ণ হবেন বলো ?

—সত্যি কি টোরাদ্বীপে যাবেন ভাবছেন ?

—যাব। ডঃ গড়গড়ি সেজন্যেই এসেছিলেন। তবে এবার উনি যাবেন গোপনে বেসরকারী ভাবে। আমার সাহায্য চান।

—কেন ?

—ওঁর মনে একটা ধাঁধা ঢুকেছে।

—খুলে বলুন।

—টোরাদ্বীপ আসলে একটা তিনকোণা পাহাড়। সমুদ্র থেকে ঠেলে উঠেছে টুপির মতো। চারধার অবশ্যি ততকিছু খাড়া নয়, অনেকটা গড়ানে বা ঢালু। জায়গায়-জায়গায় সমতল চত্বরও আছে। আগাগোড়া জঙ্গলে ঢাকা। পাথর তো আছেই। খাড়ি বলতে মাত্র শ'তিনেক ফুট উঁচু এবং শ'খানেক ফুট চপড়া একটা অংশ। সেখানটা দেয়ালের মতো সোজা উঠেছে সমুদ্র থেকে। প্রচণ্ড বেগে জল আছড়ে পড়ে আর দেয়ালের মাথা অব্দি ছিটকে ছড়িয়ে

যায়। কানে তালা ধরে যায় তার শব্দে। তো ডঃ গড়গড়ির ধারণা ওইখানে কোথাও বিদ্‌ঘুটে সিংহ-মানুষটা থাকে এবং কিছু পাহারা দেয়।

—পাহারা দেয়? কী পাহারা দেয়? গুপ্তধন বুঝি?

—কে জানে! তবে ডঃ গড়গড়ির মাথায় আরও একটা আজব ধারণা ঢুকেছে যে নৃসিংহটা হয়তো একালেরই বিজ্ঞানীর তৈরী একটা রোবো অর্থাৎ নিছক যন্ত্রমানুষ।

কর্নেলের পাশে সোফার ওপর খামে ছবিটা রয়েছে। হাত বাড়িয়ে সেটা নিলুম। খুলে ছবিটা দেখতে দেখতে বললুম—অসম্ভব! লোমওয়ালা একটা মানুষের মাথা সিংহের মতো। একরাশ কেশর আছে। বড় বড় হিংস্র দাঁত বের করে আছে। এ কখনো যন্ত্র হতে পারে না।

কর্নেল আনমনে বললেন—ঠিক বলেছ। আতস কাঁচ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি। যন্ত্র বলে মনে হয় না।

আমরা কথা বলতে বলতে ফোন বাজল। কর্নেল ফোন ধরে কার সঙ্গে চাপা গলায় কিছুক্ষণ কথা বললেন। তারপর ফোন নামিয়ে রেখে গম্ভীর মুখে টাকে মৃদু-মৃদু টোকা দিতে লাগলেন। দেখলে মনে হবে, ওস্তাদ তবলচী তবলায় হাতুড়ির ঘা মেরে সুর লাগাচ্ছেন। অবশ্য ব্যাপারটা কতকটা সেরকমই। কর্নেল বলেন, ডার্লিং! মাঝে মাঝে মাথার ঘিলু নানারকম চিন্তার চাঁটি খেয়ে বেসুরো হয়ে যায়। তখন ঠিক সুরে বাঁধতে হলে এই কাজটি জরুরী।

মগজের সুর বেঁধে কর্নেল হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে বললেন, জয়ন্ত! এইমাত্র এক ভদ্রলোক ফোনে বললেন, তাঁর বাড়িতে সম্প্রতি এক বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার ঘটেছে। তিনি আমার সাহায্য চান।

বললুম—তা কে না চায়? আপনি প্রখ্যাত বুড়ো ঘুঘু। যেখানে

বিদ্‌ঘুটে কিছু ঘটে, সেখানেই আপনার ডাক পড়ে। এতে অমন গোমড়া মুখে ঘিলু নিয়ে ব্যস্ত হবার কী আছে?

কর্নেল একটু হাসলেন।—আছে মনে হচ্ছে। কারণ মাস তিনেক আগে ভদ্রলোকের ঠাকুরঘর থেকে পুরানো আমলের একটি দশাবতার মূর্তি চুরি গিয়েছিল। কষ্টি পাথরের একটা চওড়া ফলকের ওপর খোদাই করা দশটি মূর্তি। অদ্ভুত ব্যাপার গতকাল ফলকটা উনি বাগানের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছেন। কিন্তু ফলকের একটা মূর্তি খুবলে নিয়েছে চোর। বাকি নটা মুর্তি যেমন ছিল, তেমনি আছে। কোন মূর্তিটা নিয়েছে জানো? নৃসিংহের।

—এ্যাঁ! আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

কর্নেল দাড়ি চুলকে বললেন--টোরাদ্বীপের ঘটনার সঙ্গে এ ঘটনার যোগাযোগ আছে কি না বলা কঠিন। নিছক আকস্মিক যোগাযোগও হতে পারে। অর্থাৎ কাকতালীয় যোগ।

--তাই হবে, কর্নেল! কাক এসে তালগাছে বসল, আর একটা পাকা তাল পড়ল দেখে কেউ যদি ভাবে, কাক এসে বসল বলেই তালটা পড়ল তাতে কোনও যুক্তি নেই। কাক না বসলেও তালটা পড়ত। কাজেই টোরাদ্বীপের জ্যান্ত নৃসিংহ, আর আপনার ওই ভদ্রলোকের চুরি যাওয়া পাথুরে নৃসিংহের মধ্যে কোনও সম্পর্ক থাকতেই পারে না।

বললেন—কিন্তু এটাও অদ্ভুত যে এই ভদ্রলোক একজন নামকরা চিকিৎসাবিজ্ঞানী। শল্যচিকিৎসা বা সার্জারিতে এঁর বিশ্বব্যাপী খ্যাতি আছে।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—কী নাম বলুন তো?

—ডঃ পরমেশ পুরকায়স্থ।

—নাম শুনেছি। কিন্তু এতে অদ্ভুত কী দেখতে পাচ্ছেন?

কর্নেল আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—জয়ন্ত, হাতে যদি সময়

—এঁ্যা। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

থাকে তো এস আমার সঙ্গে।

—কোথায় বলুন তো?

—ডঃ পুরকায়স্থের বাড়ি। উনি সল্টলেকে বাড়ি করেছেন বছর দুই আগে। ঠিকানা ফোন গাইডে পেয়ে যাব বললেন।

—আপনার মাথা খারাপ? এই রাত্রিবেলা জনমনুষ্যহীন ওই ভুতুড়ে এলাকায় আপনি ওঁর বাড়ি খুঁজে বের করতে পারবেন, ভেবেছেন? গেছেন কখনও ওই এলাকায়?

কর্নেল হাসলেন। —তুমি ঠিকই বলেছ বৎস! একবার রাত্রিবেলা সল্টলেকে আমার এক বন্ধুর বাড়ি গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্নে গিয়ে ফেরবার সময় তিনঘণ্টা ঘুরে মরেছিলুম। সব রাস্তা একরকম —দূরে দূরে একটা করে বাড়ি। লোকজন নেই রাস্তায়। গোলকধাঁধা!

—তাহলে কোন সাহসে যেতে চাইছেন এখন?

কর্নেল ফোন গাইডের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন— ডার্লিং! কলকাতার লোকেরা নীরস একঘেয়ে জীবনযাত্রার মধ্যে থেকে যখন হাঁফিয়ে ওঠেন, আমি তাঁদের পরামর্শ দিতে চাই—যদি বৈচিত্র্য চান, রোমাঞ্চ চান, বুক ঢিপঢিপ করা আতঙ্ক আর তার সঙ্গে এ্যাডভেঞ্চারের দুঃসাহসী আনন্দও পেতে চান, তাহলে আপনারা রাত্রিবেলা সল্টলেকে চলে যান। সারারাত ঘুরুন। মনে হবে সে এক অজানা রহস্যময় দেশ। মাথার ওপর ঝলমল নক্ষত্র, কিংবা ভুতুড়ে চাঁদ—প্রান্তরব্যাপী ধূসর কুয়াশা আর হলুদ জ্যোৎস্নার মধ্যে একটা করে বাড়ি—নিঃশব্দ নির্জন বাড়ি— কী তাদের রহস্য! কী আশ্চর্য রূপমহল! সেখানে আরব্য উপন্যাসের দৈত্য আর পরীরা সারারাত ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায় এবং…

আমি অবাক হয়ে আমার বৃদ্ধ বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থিয়েটারী সংলাপ বা প্রলাপ শুনছিলুম, সেই সময় ওঁর ভৃত্য

ষষ্ঠীচরণ কফির পেয়ালা সাজানো ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে একগাল হেসে বলল - স্যার! আমাদের পেরজাপতিগুলো ডিম পেড়েছে আজ। সেদিনকে বললেন না—ষষ্ঠী, পেরজাপতির ডিম দেখিও। এবার দেখবেন আসুন।

কর্নেল সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে লাফিয়ে উঠলেন। —এ্যাঁ! ডিম পেড়েছে ডিম? ও হো, কী সুখের কথা! জয়ন্ত! বুঝতে পারছ কি, কী প্রকাণ্ড অসম্ভব আমি সম্ভব করেছি? শীতকালে প্রজাপতিদের ডিম পাড়িয়েছি। দৈনিক সত্যসেবকের জন্যে এই অত্যাশ্চর্য খবর তুমি নিয়ে যেতে পারো, বৎস! ...বলেই উনি ওঁর পরীক্ষাগারের দিকে দৌড়লেন। ফোন গাইড পরে রইল।

তিন

ঠাকুরমশাইয়ের নতুন যজমান

প্রজাপতিগুলোকে অশেষ ধন্যবাদ। তারা জানুয়ারী মাসের ঠাণ্ডা কনকনে রাতে সল্টলেকে এ্যাডভেঞ্চারের হাত থেকে রক্ষা করল। কল্পনা করে শিউরে উঠেছিলুম, কুয়াশায় ঢাকা সল্টলেকের জনহীন রাস্তায় আমাদের গাড়ি সারারাত পেট্রল পুড়িয়ে হন্যে হচ্ছে—কিন্তু বেরুনোর পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

সে রাতে আন্দাজ দশটায় যখন 'বুড়ো ঘুঘুর বাসা' থেকে বেরুচ্ছি, তখনও ঘুঘুমশাই প্রজাপতির খাঁচার সামনে ঝুঁকে ধ্যানে মৌনীবাবা হয়ে রয়েছেন। আমার বিদায় সম্ভাষণ কানে শুনলেন বলে মনে হলো না দরজা আটকাতে এসে বেচারা ষষ্ঠী করুণ মুখে বলল—আজ রাতে আর আমার খাওয়া-শোওয়া হবে না স্যার।...

পরদিন সকালে উনি হঠাৎ আমার ফ্ল্যাটে হাজির হয়ে

বললেন—এস জয়ন্ত বেরিয়ে পড়া যাক।

অতএব বেরুতে হলো। হ্যাঁ, সেই সল্টলেকে পরমেশ ডাক্তারের বাড়ি। সারা পথ কর্নেল প্রজাপতি বিষয়ে সমানে বকবক করলেন। কান পাতলুম না। বাড়ি খুঁজে বের করতে প্রায় মিনিট কুড়ি লাগল। গেটের মুখে প্রকাণ্ড একটা এ্যালসেশিয়ান কুকুব আমাদের দেখে আপত্তি জানাল। তারপর যিনি হাসিমুখে এসে কুকুরটার বকলেস ধরে আমাদের সম্ভাষণ জানালেন, তিনি প্রখ্যাত শল্যবিদ ডঃ পুরকায়স্থ।

প্রথমে কর্নেল গেলেন বাগানে, যেখানে দশাবতার ফলকটা ফেরত পাওয়া গেছে। বাগান বলতে আমি যা ভেবেছিলুম, তেমন কিছু নয়। অল্প একটুখানি জায়গায় নানারকম ফুলের গাছ আর ক্যাকটাস। এটা বাড়ির পেছন দিক। তার ওপাশে অনেকটা খোলা পোড়ো জায়গা। কাশকুশের বনে ভরা। কর্নেল বেড়ার ওধারে গিয়ে সেই ঘাসের জঙ্গলে কী সব খুঁজে-টুজে এসে বললেন—হুম! চলুন পরমেশবাবু, আপনার দশাবতার দর্শন করা যাক!

পরমেশ ম্লান হেসে বললেন—নবমাবতার বলুন কর্নেল!

কর্নেল হাসলেন। ঠিক বলেছেন। নবমাবতার।

বসার ঘরে আমাদের রেখে পরমেশ ভেতরে গেলেন এবং একটু পরে পেতলের সুদৃশ্য রেকাবে একটা কষ্টিপাথরের ফলক নিয়ে এলেন। ফলকটা মোটে ইঞ্চি নয় লম্বা এবং ইঞ্চি ছয়েক চওড়া। দশটা ভাগে ভাগ করা আছে। প্রত্যেকটা ভাগে একটা করে অবতারের মূর্তি খোদাই করা। ঠিক মধ্যিখানে একটা এবড়ো-খেবড়ো খোঁদল। বুঝলুম ওখানেই নৃসিংহ মূর্তিটা ছিল।

কর্নেল কোটের পকেট থেকে আতসকাচ বের করে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন ফলকটা। পরমেশ বললেন—একটা ব্যাপার লক্ষ্য করুন। ফলকটার চারটে ভাগ। প্রথম সারি ও দ্বিতীয় সারিতে রয়েছে তিনটে করে ছ'টা মূর্তি। তৃতীয় সারিতে কিন্তু

একটাই মূর্তি ছিল—নৃসিংহ মূর্তি। তার দু' ধারে দুটো পদ্মফুল দেখতে পাচ্ছেন! চোর শুধু ওই মূর্তিটাই খুবলে তুলে নিয়েছে। চতুর্থ সারিতে তিনটে মূর্তিও অক্ষত আছে।

কর্নেল মুখ তুলে বললেন—এই ফলকটা ঠাকুরঘরে ছিল বলছেন। ঘরটা একবার দেখতে পারি?

পরমেশ বললেন—নিশ্চয়! তবে একটু অপেক্ষা করুন। আমার স্ত্রী এখন ও-ঘরে পুজো দিচ্ছেন। ঠাকুরমশাই রয়েছেন। পুজোটা শেষ হোক।

ভেতর থেকে আবছা ক্ষীণ ঘণ্টার শব্দ শুনছিলুম। কর্নেল বললেন—হুম। ফলকটার গায়ে সিঁদুরের ছোপ দেখছি পরমেশ-বাবু! তার মানে দশাবতারেরও পুজো হতো। এই তো?

পরমেশ বললেন—হ্যাঁ। তবে আমাদের গৃহদেবতা কিন্তু রাধাকৃষ্ণ। আমাদের পূর্বপুরুষ বৈষ্ণব।

কর্নেল হঠাৎ হেসে উঠলেন।—সর্বনাশ! বৈষ্ণব হয়ে আপনি ছুরি চালিয়ে প্রাণীদের কাটাকুটি করেন এবং রক্তপাত ঘটান?

পরমেশও হো হো করে হেসে উঠলেন।—আমি মশাই ধর্মটর্মের ধার ধারিনে। পাষণ্ড নাস্তিক বলতে পারেন। আমার বাবাও তাই ছিলেন। আপনি শুনে থাকবেন বাবার নাম—কারণ আপনি মিলিটারিতে ছিলেন। আমার বাবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিলিটারি ডাক্তার ছিলেন। বাবার নাম ডাঃ অজিতেশ পুরকায়স্থ। মেজর পুরকায়স্থ নামে সবাই তাঁকে চিনতেন।

কর্নেল নড়ে বসলেন।—মাই গুডনেস! মেজর পুরকায়স্থকে আমি ভীষণ চিনতুম। সিঙ্গাপুর পুনর্দখলের সময় আমার উরুতে সামান্য জখম হয়েছিল। টুকরো একটা শার্পনেল লেগেছিল। আপনার বাবা অপারেশন করেছিলেন। আমার চেয়ে বয়সে বেশ বড়ো ছিলেন। তাহলেও আমাদের বন্ধুত্বে আটকায় নি।

পরমেশ খুশি হয়ে বললেন—এখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে,

যেন বাবার আত্মাই আমাকে আপনার পরামর্শ নিতে প্রেরণা দিয়েছে। নৈলে পুলিশের কাছে না গিয়ে আপনাকে জানাতে গেলুম কেন?

কর্নেল বললেন—যাক গে। এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকুন।

—বেশ তো, বলুন।

—দশাবতার ফলকটা দেখে আমার মনে হচ্ছে, এ ধরনের মূর্তি এদেশে কখনও দেখিনি। এই ফলক আপনাদের পরিবারে কীভাবে এল?

—বাবা ওটা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালে মালয়েশিয়া এলাকায় উনি ছিলেন। সেই সময় ওঁকে একবার টোরাদ্বীপে যেতে হয়েছিল। যেখানে···

কর্নেল ও আমি মুখ তাকাতাকি করলুম। আমি চমকে উঠেছি। কিন্তু কর্নেল শান্তভাবে বললেন—হুম! বলুন!

—টোরাদ্বীপে আমেরিকান সৈন্যদের একটা গোপন ঘাঁটি ছিল। জাপানীরা পালাবার সময় ঘাঁটিতে গোলাবর্ষণ করে যায়। কয়েক-জন সৈন্য সাংঘাতিক আহত হয়। তাই বাবাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওখানে। যাইহোক, উনি ওই দ্বীপেই ফলকটা কুড়িয়ে পান। উনি রিটায়ার করার পর ফলকটা ঠাকুরঘরে রাখা হয়। তারপর তো বাবা মারা গেলেন। আমি সল্টলেকে বাড়ি করে চলে এলুম। ফলকটা যথারীতি এ বাড়িতেও ঠাকুরঘরে রাখা হয়েছিল।

—বেশ। ফলকটা চুরি গেল কবে এবং কীভাবে?

—গত পূজোয় আমরা কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিলুম। দারোয়ান রেখে গিয়েছিলুম। বাড়িতে আসবাবপত্র ছাড়া খুব দামী জিনিস আমি রাখিনে। সব ব্যাংকের লকারে থাকে। অবশ্যি চোরের কাছে সবই দামী। তো কাশ্মীর থেকে ফিরে দেখি কিছু খোওয়া যায়নি। দারোয়ান খুব বিশ্বাসী। ঠাকুরঘরের চাবি

অবশ্যি তার কাছে রেখে গিয়েছিলুম। ঠাকুরমশাই এসে পুজো করে যেতেন রোজ। আমার স্ত্রীর আবার ধর্মকর্মের প্রচণ্ড বাতিক। যাইহোক বাড়ি ফেরার কয়েকদিন পরে হঠাৎ ঠাকুরমশাই জানালেন, দশাবতার নেই। আসলে আমরা কেউ লক্ষ্য রাখিনি ব্যাপারটা। কাজেই ঠিক কবে বা কখন চুরি গেল, বলা খুব কঠিন।

—ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারি কি ?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। পুজোটা হয়ে যাক।

এতক্ষণে চা সন্দেশ ইত্যাদি এল। অতিথি সৎকারে ব্যস্ত হলেন পরমেশবাবু। চা খেতে খেতে কর্নেল হঠাৎ বললেন—আচ্ছা পরমেশবাবু, যদি আপনাকে অনুরোধ করি—আমাদের সঙ্গে টোরাদ্বীপে চলুন, আপনি যাবেন ?

পরমেশ হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—কেন বলুন তো ?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন—আপনার যাওয়া দরকার। আপনিই টোরাদ্বীপের নৃসিংহ রহস্য ভেদ করতে পারবেন। কারণ আপনি একজন কুশলী শল্যবিদ। তবে তার আগে আপনাকে আগাগোড়া সব কথা জানানো দরকার। আমার বিশ্বাস, আপনার নৃসিংহ মূর্তি চুরির পেছনে একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার রয়েছে।

এরপর কর্নেল চাপা গলায় সম্প্রতি টোরাদ্বীপে সরকারী সমীক্ষক-দলের ভীষণ পরিণতির ঘটনা বলতে শুরু করলেন। শুনতে শুনতে ডঃ পরমেশ পুরকায়স্থ যে উত্তেজিত হয়ে উঠছেন, তা ওঁর মুখের ভাবে টের পাচ্ছিলুম। সবটা শোনার পর উনি বললেন—এ তো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার ! টোরাদ্বীপে সত্যিসত্যি নৃসিংহ রয়েছে—এবং আমার বাবা সেখানেই এই ফলক কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, দুটোতেই কেমন যেন যোগসূত্র আছে মনে হচ্ছে। ঠিক আছে। আমি যাব আপনাদের সঙ্গে।

কিছুক্ষণ পরে আমরা ঠাকুরঘরে গেলুম। দরজার পাশে একটা

টিকিওয়ালা লোক বসে আছে দেখলুম। গায়ে একটুকরো উত্তরীয় এবং পরনে কোরা ধুতি। কাঁধে একটা থলে। বুঝলুম, ইনিই ঠাকুরমশাই।

কর্নেল খুব ভক্তিভরে ঠাকুরঘরে উঁকি মারার পর ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে থাকলেন। দুজনে যে কথাবার্তা হলো, তা এই :

—নমস্কার ঠাকুরমশাই!

—নমস্কার স্যার, নমস্কার।

—এতদূরে পুজোআচ্চা করতে আসেন কি পায়ে হেঁটে? নাকি সাইকেলে?

—না স্যার, সাইকেলে। সল্টলেক তো মাঠ ময়দান জায়গা। পায়ে হেঁটে কি অতগুলো বাড়ির পুজো সারা যায়? এক যজমানের বাড়ি টালা, তো আরেক যজমানের বাড়ি বাঙ্গুরে। বুঝলেন না ঝামেলাটা?

—বুঝলুম বৈকি। তা এতসব পুজো না করে বড়সড় দুতিনটে যজমান ধরলেই তো হয়।

—মাথা খারাপ স্যার! এ কি সে সত্যযুগ আছে? ঘোর কলি। লোকের ধর্মবোধই নেই। ধর্মকর্মে এক পয়সা খরচ করতে হলেই মুখ ভার।

—আচ্ছা ঠাকুরমশাই, যদি—ধরুন বড়সড়ো যজমান পেয়ে যান, আপনাকে ভাল মাইনে কড়ি দেবে, জামাকাপড় মায়-খোরাকীও দেবে, আপনি যাবেন?

—এক্ষুনি যাব স্যার, এক্ষুনি। কাঁহাতক আর বাড়ি-বাড়ি দু'চার পয়সা কুড়িয়ে ঘোরা যায়?

—ভাল। তাহলে ঠিকানা দিন। কথা বলে আপনাকে জানাব।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলুম। এরপর দেখলুম, কর্নেল নোটবই বের করে নাম ঠিকানা টুকে নিলেন! ঠাকুরমশাই গদগদ হয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইল। পরমেশবাবুর স্ত্রী কড়া চোখে ব্যাজার মুখে

কর্নেল ঠাকুর মশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে থাকলেন।

কর্নেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আরও কিছুক্ষণ ডঃ পুরকায়স্থের বাড়িতে কাটিয়ে আমরা যখন রাস্তায় পৌঁছলুম, তখন দেখি ঠাকুরমশাই সাইকেলে চেপে সোজা কাশকুশের জঙ্গল ভেঙে চলেছেন। মনে হলো, সাইকেল চাপার ব্যাপারে ভারি দক্ষ লোক। পথ-বিপথ মানেন না। পাখির মতো ডানা মেলে দিয়েছেন যেন।

গাড়ি ষ্টার্ট দিয়ে বললুম—হাই ওল্ড ঘুঘু! ব্যাপারটা কী?

অন্যমনস্ক জবাব এল—উঁ?

—আপনি তো সায়েব মানুষ। হঠাৎ ঠাকুরমশাইয়ের বড়লোক যজমান খুঁজে দিতে এত উৎসাহ কেন?

—ডার্লিং! যজমানটি কে হবেন জানো? স্বয়ং লালবাজার গোয়েন্দা দফতরের ডেপুটি কমিশনার আনোয়ার খান।

ঘ্যাঁচ করে গাড়ির ব্রেক কষে দিলুম। নৈলে পাথরের ওপর দিয়ে চাকা গড়িয়ে গর্তে পড়ত। এবং আকাশ থেকে পড়ে বললুম—মুসলমান যজমানের বাড়ি পুজোআচ্চার কাজ? কী বলছেন আবোলতাবোল। এর অর্থ কী?

কর্নেল হাসলেন।—লোকটা দাগী। দেখেই চিনেছি। আনোয়ার খানের সামনে ওকে পৌঁছে দিতে পারলেই জানতে পারবে, নৃসিংহ রহস্যের পিছনে কে বা কারা রয়েছে। যাই হোক, ষ্টার্ট দাও বৎস! আমাদের এখন অনেক জায়গায় ছোটাছুটি করতে হবে।··

চার

ডঃ গড়গড়ির চমকপ্রদ আবিষ্কার

জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডঃ গুটেনবার্গের সঙ্গে সেদিন আলাপ হয়েছিল। খুব আমুদে মানুষ। ইংরেজির চেয়ে বরং হিন্দিই রপ্ত করেছেন বেশি। কথায় কথায় হেসে বলেন—ম্যায় হিন্দি

সমঝতে হেঁ। কর্নেলের বয়সী এই জার্মান বিজ্ঞানী চেহারায় অবিকল কর্নেলের মতো। দূর থেকে দেখলে বোঝা কঠিন, কর্নেল, না ডঃ গুটেনবার্গ।

তাঁর কাছেই জানা গেছে টোরা আইল্যাণ্ড একটা বেওয়ারিশ দ্বীপ। পূবে ইন্দোনেশিয়া, উত্তরে আন্দামান নিকোবর এবং পশ্চিম ও দক্ষিণে ফাঁকা অনন্ত অথৈ ভারত মহাসাগর। টোরাদ্বীপের মালিকানা নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের আদালতে তিন দেশের মধ্যে বহুকাল ধরে মামলা চলছে। ভারত, ইন্দোচীন ও মালয়েশিয়া তিন দেশেরই দাবী টোরা আমাদের। এখনও ফয়সালা হয় নি। ক'বছর আগে পর্যন্ত ওখানে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রহরীবাহিনী টহল দিত। কিন্তু নানা অসুবিধার জন্য তাদের সরিয়ে নিতে হয়। সেই অসুবিধেগুলো কী, খুলে বলা হয় নি। কিন্তু এখন আমরা সবই আঁচ করেছি। তবে ভারত সরকার যে ওখানে সমীক্ষক দল পাঠিয়েছিলেন, সেটা খুব গোপন ব্যাপার। কারণ যে দ্বীপ নিয়ে মামলা চলছে, সেখানে সমীক্ষক দল পাঠানো চলে না। তাই নৃসিংহের হাতে বিজ্ঞানীদের খুন হবার ব্যাপারটা নিয়ে এত লুকোচুরি।

এই যে জার্মান বিজ্ঞানীরও সাহায্য নিয়েছে, তাও গোপনে। আসলে ডঃ গুটেনবার্গ ভারত-জার্মান বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা-চুক্তি অনুসারে ভারতে আছেন। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কাজ করছেন। তাঁর টোরা অভিযানে যাওয়ার ব্যাপারটা বেসরকারী ভাবে। অর্থাৎ নিজের দেশের সরকারকেও উনি এটা জানান নি। সবসময় সরকারী নিষেধাজ্ঞা মেনে চললে কোনকালে কি বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানকে এতখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন? এক সময় রাষ্ট্র তো বিজ্ঞানীকে শত্রু ভাবত।

কাজেই পুরো ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপন। অথচ সরকারী গোপনীয়তার পাঁচিল ডিঙিয়ে ব্যাপারটা কর্নেলের হাতে এসে পড়ল এবং আমিও তার সঙ্গে জড়িয়ে গেলুম। সেইসঙ্গে এও বুঝতে পারলুম

যে কর্নেল যথাসময়ে দিল্লীতে সাংবাদিকদের ডেকে কর্তৃপক্ষ যে বিবৃতি দেবেন বলছেন—সে নিতান্ত ধোঁকা। সরকার অত বোকামি করবেনই না। তাহলে যে ইন্দোনেশিয়া আর মালয়েশিয়া হৈ চৈ জুড়ে দেবে। কেন বিচারাধীন এলাকায় ভারত নাক গলাতে গেল ?

আমাদের একটা বড় সুবিধে, পাসপোর্ট-ভিসা কিছু লাগছে না। আমরাও গোপনে যাচ্ছি। প্রথমে আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারে বিমান থেকে নামলুম। পাঁচজন স্রেফ পর্যটক বেড়াতে এসেছি অন্যদের মতো।

ওদিকে কলকাতা থেকেই ব্যবস্থা করা হয়েছে, গভীর সমুদ্রে মাছধরা জাহাজ 'শার্ক' অর্থাৎ হাঙর নিয়ে গিয়ে টোরাদ্বীপের কাছাকাছি নামিয়ে দেবে।

না, জলে নামিয়ে দেবে না। কর্নেলের এ বাহাদুরির তুলনা নেই। নৌ বাহিনীতে তাঁর পরিচিত এক কর্তা ব্যক্তির সাহায্য যোগাড় করেছেন। টোরাদ্বীপের একমাইল দূরে রাত তিনটে নাগাদ চুপি চুপি একটা মিলিটারী মোটরবোট এসে অপেক্ষা করবে। আমরা 'শার্ক' থেকে তাতেই নামব এবং দ্বীপে পৌঁছব।

পোর্টব্লেয়ারের একটা হোটেলে আড্ডা নিলুম আমরা। সত্যি বলতে কী এবার আমার মনে রীতিমত আতঙ্ক ছমছম করে উঠেছে। বিশাল সমুদ্রের মধ্যে এক অজানা ছোট্ট দ্বীপ। তার বিভীষিকা মনে এখনই ছায়া ফেলেছে। আমি খুব মনমরা হয়ে গেলুম। পৈতৃক প্রাণটি এবার বেঘোরে না হারাতে হয়।

কর্নেল তো সারাক্ষণ সমুদ্রের ধারে-ধারে নানা জাতের কাঁকড়া শামুক সংগ্রহে ব্যস্ত। ডঃ গুটেনবার্গ গাছপালার জঙ্গল ঢুঁড়ে কী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ডঃ হরিহর গড়গড়ির শরীর ভাল নয়। সামুদ্রিক হাওয়া-বাতাস নাকি সয় না। ঘরে চুপচাপ বসে প্রকাণ্ড বই পড়ছেন। ভাগ্যিস পরমেশবাবু এসেছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে

ঘুরছি। দুজনে মতলব আঁটছি, শার্ক এসে পৌছনোর আগেই একবার জারোয়ারদের এলাকায় ঘুরে আসতে পারলে মন্দ হত না। জারোয়াররা আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের এক জংলী উপজাতি। ভারি হিংস্র আর বুনো মানুষ। গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। সভ্য মানুষ দেখলেই নাকি বিষাক্ত তীর ছোঁড়ে। তবে আমরা বেশি কাছে যাব না। ওই এলাকাটা একটু দূর থেকে দেখেই চলে আসব।

পরমেশ এখানকার এক বাঙালী ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে নৌকোর ব্যবস্থা করে ফেললেন। পরদিন সকালে আমরা দু-জন যাব। কর্নেল বা আর কাকেও জানাব না, পাছে বাগড়া দেন ওঁরা।

কিন্তু আমাদের ভাগ্যে জারোয়া যাওয়া আর হলো না। সেই রাতেই দেড়টার সময় ঘুম থেকে তুলিয়ে কর্নেল বললেন, শার্ক এসে গেছে। এক্ষুনি বেরুতে হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পিঠে বোঁচকাবুঁচকি বেঁধে পায়ে হেঁটে আমরা চারজনে প্রথমে ডক এলাকায় গেলুম। শার্কের একজন লোক আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল। ডক এলাকার ধারে ধারে মাইলটাক গিয়ে মেছো জেটির কাছে পৌছলুম। ওদিকটায় আলো খুব কম। মাছের আঁশটে গন্ধে গা ঘুলিয়ে যাচ্ছিল। জায়গায়-জায়গায় কাদায় পা ডুবে যাচ্ছিল। তারপর একেবারে অন্ধকার চারদিক। খালি গর্জন শোনা যাচ্ছে সমুদ্রের। পাথুরে খাড়ির মধ্যে শার্ক অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু মাস্তুলের মাথায় একটু আলো জুগ জুগ করছে। আমাদের পথ-প্রদর্শক এবার টর্চ জেলে আমাদের একটা ছোট্ট বোটে ওঠাল। খাড়ির মধ্যে প্রচণ্ড ঢেউ। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে, আমরা জলে তলিয়ে যাব। ঢেউয়ের ঝাপটায় প্রায় ভিজে গেলুম সবাই। নোনা জলের কুচ্ছিত গন্ধ আর মাঝে মাঝে মুখে ঝাপটা মারা জল এসে ঢুকছে। ব্যাপারটা বড্ড বিরক্তিকর।

তবে মিনিট দশেক এই লাঞ্ছনা পোহাতে হলো। আমরা দড়ির সিঁড়ি বেয়ে শার্কে উঠে পড়লুম।

শার্কেই গোপনে কলকাতা থেকে আমাদের রাইফেলের বাকসোটা এসেছে। মোটমাট চারটে রাইফেল আর অজস্র গুলি আনা হয়েছে। ডিনামাইট, গ্রেনেডও আনা হয়েছে। তাছাড়া চারটে রিভলবার আমাদের কাছেই আছে, শুধু গড়গড়ি সায়েবের কোনও অস্ত্র নেই। উনি বেজায় অহিংস মানুষ। নিরামিষ খান। অস্ত্রশস্ত্র দেখে আঁতকে উঠে বললেন --ওরে বাবা! এ যে যুদ্ধের আয়োজন!

পরমেশবাবু মুচকি হেসে বললেন—বরং নৃসিংহবধ পালা বলতে পারেন।

ডঃ গড়গড়ি মনমরা হয়ে গেলেন। বললেন- রক্ষে করুন মশাই। গোলাগুলির মধ্যে আমি নেই।

আমি বললুম—কিন্তু নৃসিংহ ঠেকাবেন কী দিয়ে?

ডঃ গড়গড়ি বললেন—এই বিদ্‌ঘুটে জন্তুটাকে ঘাঁটাবার কী দরকার? জানেন? আমি ওবারেও পইপই করে বলেছিলুম, ওটাকে এড়িয়ে যে যা কাজ করতে এসেছেন করুন। আমি পুরাতাত্ত্বিক জিনিষ কিছু পাই নাকি খুঁজি। ডঃ গুটেনবার্গ উদ্ভিদের খবরাখবর যোগাড় করুন। প্রত্যেককে বলেছি এমন কথা। কেউ কান দিলেন না। জন্তুটার গুহার কাছে গিয়ে বেমক্কা গণ্ডগোল বাধিয়ে ছাড়লেন। প্রাণ তো গেলই, কাজ ভণ্ডুল হলো —সেটাই বড় কথা কিনা বলুন?

কর্নেল বললেন -কিন্তু ডঃ গড়গড়ি, নৃসিংহকে না ঘাঁটালে তার রহস্য কীভাবে ভেদ করতেন বলুন?

ডঃ গড়গড়ি বললেন—সেটাই খুঁজে বের করুন। ওকে না ঘাঁটিয়ে…

বাধা দিয়ে ডঃ গুটেনবার্গ ইংরেজীতে বললেন—ভাববেন না ডঃ গড়গড়ি। প্রাণীটাকে এবার আমরা বন্দী করে ফেলব কৌশলে।

সে আক্রমণের কোনও সুযোগই পাবে না।

—তা পারলে ভালই হয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ও কাজ মানুষের সাধ্য নয়। বলে ডঃ গড়গড়ি হঠাৎ মাতালের মতো টলতে টলতে আর্তনাদ করে উঠলেন—এ কী! এ কী! সমুদ্রে ভূমিকম্প হচ্ছে যে।

আমরা হেসে উঠলুম। কর্নেল বললেন—না ডঃ গড়গড়ি! জাহাজ চলতে শুরু করেছে।

আমরা খোলের মধ্যে একটা সুন্দর আরামদায়ক ঘরে আছি। শার্কের পাঞ্জাবী মালিক জগদীপ সিং এতক্ষণে আলাপ করতে এলেন। তারপর কফি এল। কফি খেতে খেতে হঠাৎ ডঃ গড়গড়ি বলে উঠলেন—আপনাদের একটা কথা এবার বলা কর্তব্য, যা এ যাবৎ বলিনি। টোরাদ্বীপে গিয়ে আমি প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের এক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন অবিষ্কার করেছি। তাই আমার উদ্দেশ্য নৃসিংহ রহস্য ভেদ নয়, সেই সভ্যতার আরও নিদর্শন সংগ্রহ। পৃথিবীকে আমি চমকে দিতে চাই—সুমের' মিশর বা মহেনজোদারোর প্রাচীন সভ্যতার চেয়ে আরও পুরনো এক সভ্যতা আমি আবিষ্কার করেছি, যা থেকে প্রমাণিত হবে যে স্থলচর মানুষরা নয়, জলচর মানুষই প্রথম সভ্যতার জনক। রথ নয়, জলযানই প্রথম সভ্যতা বহনকারী।...

মনে মনে বললুম—তাই করুন। সেজন্যেই আপনার মতো রোগাপটকা লোকের এত উৎসাহ!

পাঁচ

ঘটনার ঘোরপ্যাঁচে

আমাদের খোলের মধ্যে প্রায় বন্দীর মতো রেখে শার্ক পরদিন মাছ ধরে বেড়ালো এখানে ওখানে। তারপর যেন মাছ ধরার উদ্দেশ্যেই

চলেছে, এমন ভাব দেখিয়ে জাহাজটা সন্ধ্যানাগাদ টোরাদ্বীপ থেকে তিন মাইলের মধ্যে পৌঁছুল। সেখানে দ্বীপের মতো সমুদ্র থেকে কয়েকটা পাহাড় যেন আচমকা মাথা তুলেই রয়ে গেছে, আর ডোবেনি। ওই এলাকায় কোনও জাহাজ যায় না। খুব বিপজ্জনক এলাকা। প্রচুর ডুবোপাহাড় রয়েছে। একটা পুরনো আমলের পোড়ো লাইটহাউসও দেখা যাচ্ছিল। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় একটা মাথা তোলা পাহাড় থেকে নিরাপদ দূরত্বে শার্ক নোঙর ফেলল। এখানে প্রচুর মাছ আছে নাকি। তবে হাঙরও বড় কম নেই।

সারারাত এখানে কাটল। ভোরবেলা ঘন কুয়াসায় সমুদ্র ও আকাশ একাকার। তার মধ্যে আমাদের ছোট্ট বোট রওনা দিল টোরাদ্বীপের দিকে। শার্কের নাবিকরা খুব অভিজ্ঞ এবং দক্ষ মানুষ। কেরলের লোক। কুয়াসার মধ্যে ডুবোপাহাড় বাঁচিয়ে কীভাবে যে আমাদের টোরাদ্বীপে পৌঁছে দিল, আশ্চর্য ব্যাপার। তবে সমুদ্র এখন শান্ত। তাই বিশেষ নাকানি-চুবানি খেতে হলো না।

ভারত মহাসাগরের এই এলাকাটা নিরক্ষরেখার কাছাকাছি। তাই শীত ক্রমশঃ কমে গেছে। আরও দক্ষিণে নিরক্ষরেখা ছাড়িয়ে গেলে আবহাওয়া একেবারে উল্টো। উত্তর গোলার্ধে যখন শীত, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল। কাজেই টোরাদ্বীপে যেন চিরবসন্ত বিরাজ করছে।

টোরাদ্বীপের ত্রিভুজের মতো অর্থাৎ পিরামিড গড়ন দেখে অবাক হলুম। দুদিকে ঢালু ও খাড়া পাথুরে দেয়াল, একদিকে—পশ্চিমে খানিকটা বেলাভূমি আছে। সেখানে আমাদের নামিয়ে দিয়ে বোট চলে গেল। কথা থাকল, আমরা উঁচু জায়গা থেকে সাংকেতিক আলো দেখালে শার্ক থেকে আবার বোটটা এখানে চলে আসবে। শার্ক আমাদের জন্যে বাহাত্তর ঘণ্টা অপেক্ষা করবে।

কুয়াসা মুছে গেলে দ্বীপের জঙ্গল এবং থমথমে চেহারা দেখে

নারকেল বনটাকে দুর্ভেদ্য মনে হলো।

এতক্ষণে আমার গা ছমছম করে উঠল। বালির বাঁচে দাঁড়িয়ে কর্নেলরা চাপা গলায় কিছু আলোচনা করছিলেন। আমি ও পরমেশবাবু বাঁচের একটু তফাতে ঘন নারকেল গাছের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছিলুম। হঠাৎ যদি নৃসিংহটা বেরিয়ে এসে হামলা করে, রিভলবার দিয়ে ঠেকানো যাবে কি? রাইফেলগুলো তো এখনও বাক্সোতে ভরা।

বোধ করি, সেকথা ভেবেই ডঃ গড়গড়ি গুটেনবার্গ সায়েবের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু পরে কর্নেল বললেন—চলুন ডঃ গুটেনবার্গ। তাহলে সেখানেই যাওয়া যাক।

রাইফেলের বাকসোটা খোলা হলো। গুলি ভরে যে-যার রাইফেল হাতে নিয়ে আশ্বস্ত হলুম। কর্নেল ডিনামাইট-গ্রেনেডের বাকসোটা একহাতে ঝোলালেন। তারপর ডঃ গড়গড়িকে বললেন— ডঃ গড়গড়ি! কিছু যদি মনে না করেন, রাইফেলের খালি বাকসোটা আপনাকে নিতেই অনুরোধ জানাব!

রোগা পটকা মানুষটি যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেই সেটা কাঁধে নিলেন। আমরা কেউ কেউ লুকিয়ে হাসলেও বুঝলুম, বেচারার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কর্নেল এখন দলের নেতা। তাঁর কথা মেনে চলতেই হবে। আমি দেখেছি, এ সব অভিযানের ক্ষেত্রে কর্নেল একেবারে রাশ-ভারি মিলিটারী লোক হয়ে ওঠেন। সেই আমুদে চেহারাটি আর থাকে না।

নারকেল বনটাকে দুর্ভেদ্য মনে হলো। অজস্র নারকেল পড়ে আছে এবং দু' এক মিনিট অন্তর দুমদাম করে নারকেল পড়ছে। মাথা বাঁচিয়ে আমরা সাবধানে চলেছি। তারপর অন্যরকম গাছ-পালার ঘন জঙ্গল শুরু হলো। কিন্তু মোটেও সমতল জায়গা নয়। ক্রমশঃ চড়াই হয়ে উঠে গেছে ওপরের দিকে। মধ্যে মধ্যে বিরাট ন্যাড়া পাথর রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দরদর করে ঘাম ঝরতে থাকল।

এখন পথপ্রদর্শক ডঃ গুটেনবার্গ। সেবারকার জায়গায় তিনি ক্যাম্প করতে চান না। নতুন জায়গায় নিয়ে গেলেন। ওপরে একটা পাহাড়ী প্রস্রবণ থেকে জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে এবং একটা খাদে জমা সেই জল আরও নীচে গড়িয়ে আবার একটা খাদে পড়ছে। সেখানে সমতল পাথরের ওপর আমরা জিনিসপত্র নামিয়ে হাঁফ ছাড়লুম। কাছে মিঠে জল থাকায় জলের অভাবে অন্তত তেষ্টায় মরতে হবে না। অবশ্য নারকেল গাছ রয়েছে নীচের দিকে। ডাবের জলে তেষ্টা মেটানো যায়। কিন্তু গাছগুলোর গায়ে ঘন লতাপাতার বেড়। তাছাড়া অনেক লতা নাকি বিষাক্ত এবং তলায় পড়ে থাকা নারকেল কুড়োতে গিয়ে সেবারে নাকি ডঃ গড়গড়ি সাপের পাল্লায় পড়েছিলেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাঁবু পাতা হলো তিনটে। ডঃ গড়গড়ি একা একটা তাঁবুতেই থাকতে চান। সঙ্গীর নাকডাকার শব্দে নাকি ওঁর বড্ড বিরক্তি জাগে। তাছাড়া সারাক্ষণ বই পড়ার স্বভাব। কেতাব সঙ্গে আনতে ছাড়েন নি।

সঙ্গে আনা টিনের খাবারে আমরা খিদে মেটালুম এবং প্রকাণ্ড ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে আনন্দে পান করলুম। ক্লান্তি চলে গেল। তারপর কর্নেল নির্দেশ দিলেন—এবার বেরিয়ে পড়া যাক।

সবাই তৈরি। ডঃ গড়গড়ি বললেন—কিন্তু ক্যাম্পে তো একজন থাকা দরকার। অন্ততঃ টিনের খাবারগুলো পাহারা না দিলে দ্বীপের রাক্ষুসে ইঁদুরগুলো সব শেষ করে ফেলবে। তাই না ডঃ গুটেনবার্গ?

ডঃ গুটেনবার্গ বললেন—তাও বটে। সেবারে আমাদের পঞ্চাশটা টিনের কৌটো খালি করে ফেলেছিলো ইঁদুরগুলো। একেকটা বেড়ালের মতো প্রকাণ্ড। দাঁত নয় যেন ইস্পাতকাটা করাত।

কর্নেল আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—তাহলে জয়ন্ত বরং পাহারা দাও।

আমি তীব্র আপত্তি জানিয়ে বললুম—কক্ষনো না। এমন কথা তো ছিল না কর্নেল!

ডঃ গড়গড়ি বললেন—আপত্তি করবেন না জয়ন্তবাবু! বরং আপনি আর আমি ক্যাম্পে থাকি। নৃসিংহ বিজয়ে আমার বিন্দু-মাত্র উৎসাহ নেই। বরং আমরা ক্যাম্পে পাহারাও দেব, আবার ধারে কাছে প্রত্নদ্রব্যও খোঁজাখুঁজি করব। সারা দ্বীপে ভাঙা মৃৎপাত্রের টুকরো ছড়ানো। বিশ্বাস না হয় এই দেখুন!

উনি সত্যিসত্যি পাথরের একটা খাঁজ থেকে একটা খোলামকুচি কুড়িয়ে দেখালেন। আমার দিকে জনান্তিকে চোখ টিপলেন। কর্নেল বললেন—দেরী হয়ে যাচ্ছে। বেশ, তাই হোক। আপনারা দুজনেই থাকুন। আসুন ডঃ গুটেনবার্গ! আসুন পরমেশবাবু!

ওঁরা পাহাড়ের ওপর দিকে জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হলে ডঃ গড়গড়ি একটু হেসে বললেন—খুব বেঁচে গেলেন মশাই! দেখবেন, এক্ষুনি ভিরমি খেতে খেতে পালিয়ে আসবে। ওসব ঝুটঝামেলায় যাবার কী দরকার বলুন না? বরং আসুন, আমরা পটারি কুড়োই। ওই দেখুন কত সব টুকরো পড়ে আছে।

বলে উনি ছেলেমানুষের মতো লাফালাফি করে পাথরের চত্বরে ফাটলগুলো থেকে খোলামকুচি কুড়োতে শুরু করলেন। আমি চুপচাপ মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখে ঘুরে বললেন—কুড়োন! কুড়োন! দৈনিক সত্যসেবকে ছেপে দেবেন। এসব পটারি অন্তত পাঁচ হাজার বছর আগেকার। হিড়িক পড়ে যাবে মশাই!

একটা ভাঙা খোলামকুচি কুড়িয়ে পরখ করে দেখলুম, সুন্দর নক্সার চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু একটু চাপ দিতেই গুঁড়ো হয়ে গেল। ডঃ গড়গড়ি যা বলেছেন, তাতে সম্ভবত কোনও ভুল নেই। এই মাটির পাত্রগুলো খুবই প্রাচীনকালের। আর এই দ্বীপে যে মানুষ বাস করত, তাও জানা যাচ্ছে। বললুম—আচ্ছা ডঃ গড়গড়ি, তাহলে কি নৃসিংহজাতীয় প্রাণীর হাতেই এখানকার অধিবাসীরা কোনও এক-

সময়ে সবংশে মারা পড়েছিল?

ডঃ গড়গড়ি বললেন—সেটা খুবই সম্ভব। তবে আমাদের হাতে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ থাকা চাই। সেই প্রমাণ সংগ্রহ করতেই আমি এত আগ্রহী। নৈলে যে বীভৎস ঘটনা চোখের সামনে দেখেছি তারপর কস্মিনকালে এই ভুতুড়ে দ্বীপে কী আর পা বাড়াতে চাইতুম জয়ন্তবাবু? যাক্ গে, আসুন না। আমরা কাছাকাছি আরও কিছুটা খোঁজাখুঁজি করে দেখি—যদি দৈবাৎ কোনও শিলা-লিপি কিংবা কোনও মূর্তি বা পুতুল কুড়িয়ে পাই।

আমার আগ্রহ বেড়ে গেছে। তাই পাথরের পাতাল থেকে নেমে গেলুম ওঁর সঙ্গে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে চাপা গলায় ডঃ গড়গড়ি বললেন—চারদিকে নজর রাখবেন মশাই। রাইফেলে গুলি পোরা আছে তো?

বললুম—আছে। আপনার উদ্বেগের কারণ নেই ডঃ গড়গড়ি!

—হুঁ। রাইফেল সব সময় তাক করে রাখবেন। বলে উনি ঝোপের ধারে একটা পাথরের ওপর যেই পা রাখলেন, অমনি পা পিছলে গড়াতে গড়াতে নীচের দিকে চললেন। ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে একটা বলের মতো গড়িয়ে নামছেন দেখে আমি আর হাসি থামাতে পারলুম না।

কিন্তু সর্বনাশ! কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই গড়গড়ি পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ঝোপের আড়ালে কোথায় যেন তলিয়ে গেলেন।

আমিও লাফ দিয়ে সেই পাথরে পড়লুম। তারপর চেঁচিয়ে উঠলুম—ডঃ গড়গড়ি! ডঃ গড়গড়ি!

মনে হলো, অনেক নীচে থেকে যেন ক্ষীণ স্বরে সাড়া এল। কিংবা আমার কানের ভুল হতেও পারে। ভাবলুম, নিশ্চয় উনি এভাবে পড়ে গিয়ে ভাল রকমের জখম হয়েছেন। অজ্ঞান হয়েছেন। অজ্ঞান হয়েই গেছেন হয়তো। তাই যত দ্রুত পারা যায়, নামতে শুরু করলুম।

এবার বোঝা গেল, পাথরগুলো খুব পিছল এবং ওপাশে সেই ঝর্ণা থাকায় ফার্ন জাতীয় গাছগাছড়া আর শ্যাওলা গজিয়ে আছে। তার ফাঁকে ফাঁকে যত রাজ্যের গাছপালা ও ঝোপঝাড় মাথা তুলেছে। তাই নীচের দিকে কিছু দেখা যাচ্ছে না।

নামতে নামতে ফের চেঁচিয়ে ডাকলুম—ডঃ গড়গড়ি! আপনি কোথায়?

কোনও সাড়া পেলুম না। নিশ্চয় ভদ্রলোক জোর আছাড় খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন কোথাও।

কিন্তু প্রায় একশো ফুট নীচে অব্দি তন্নতন্ন খুঁজে কোথাও ডঃ গড়গড়িকে দেখতে পেলুম না। যেখানে পৌঁছেছি, সেখানে মোটামুটি সমতল জায়গা এবং সেই নারকেল বনটা শুরু হয়েছে। তাঁর ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। আবছা তার গর্জন কানে আসছে। প্রচণ্ড জোরে হাওয়া বইছে তার ফলে নারকেল পড়ছে। ক্রমাগত বোম্ ফটকার আওয়াজ হচ্ছে। এখানে দাঁড়ানোও নিরাপদ নয় আমার পক্ষে। কখন মাথার ওপর নারকেল পড়ে কুপোকাৎ হয়ে যাব ঠিক নেই।

আমি ফের ওপরে উঠে দুপাশে চোখ বুলিয়ে ডঃ গড়গড়িকে খুঁজতে থাকলুম। কিন্তু আশ্চর্য, ভদ্রলোক যেন বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

আমার বুক কেঁপে উঠল এতক্ষণে। মনে হলো, দ্বীপের গাছপালা-ঝোপজঙ্গল পাথরের আড়াল থেকে কে বা কারা যেন চুপিচুপি আমাকে দেখছে। কাঁপা-কাঁপা হাতে রাইফেলটা শক্ত করে বাগিয়ে আবার চেঁচিয়ে ডাকলুম—ডঃ গড়গড়ি! ডঃ গড়গড়ি!

আমার ডাক পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হতে হতে মিলিয়ে গেল। কোনও সাড়া এল না। তখন ক্যাম্পের দিকে উঠতে শুরু করলুম।

উঠে এসে পাথরের চওড়া চাতালে দাঁড়িয়ে হাঁপ সামলাচ্ছি,

হঠাৎ চোখে পড়ল এক বিদ্‌ঘুটে দৃশ্য।

প্রথমে ভাবলুম খরগোসের পাল। তারপর মনে হল, বেড়াল। কিন্তু বেড়ালের মুখ এমন লম্বাটে হবে কেন? হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এই দ্বীপে প্রকাণ্ড ইঁদুরের কথা শুনেছি। এরা সেই রাক্ষুসে ইঁদুরই বটে।

ইঁদুরগুলো কি মানুষের ভঙ্গীতে তাঁবুর ভেতর থেকে টিনের কৌটো পিঠে নিয়ে বেরিয়ে আসছে এবং একটা ফাটল দিয়ে অদৃশ্য হচ্ছে। দুধের কৌটো, জেলির কৌটো, রান্না করা মাংসের কৌটো আর পাউরুটির প্যাকেট—সব একত্রে লুঠ হয়ে যাচ্ছে।

দৌড়ে গিয়ে তাদের মধ্যে পড়তেই বেয়াদপ ইঁদুরগুলো চারপাশ থেকে আমাকে ঘিরে ধরে হাঁটুঅব্দি লাফ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করতে থাকল আর কামড় দিল।

ভাগ্যিস পায়ে হান্টিংবুট ছিল। হাঁটুঅব্দি শক্ত চামড়ার বর্ম এবং প্যান্টের কাপড়টাও বেশ শক্ত। দাঁত বসল না। কিন্তু ওদের বেয়াদপিতে মাথা খারাপ হয়ে গেল। আমি লাথি ছুড়তে থাকলুম। লাফালাফি করে বেজায় চেঁচামেচিও শুরু করলুম। কিন্তু তাতে ওরা আরও খাপ্পা হয়ে আমার পা আঁকড়ে গায়ে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল।

এমন পাজি হতচ্ছাড়া ইঁদুর তো দেখা যায় না ভূ-ভারতে। এরা আমাকে নাকাল করে ছাড়বে দেখছি। বড় জন্তু হলে রাইফেল ছোড়া যায়। অগত্যা পাথরে গড়াগড়ি দিয়ে ওদের কাবু করার চেষ্টা করলুম। রাইফেল পড়ে রইল। চোখ বুজে রইলুম। পাছে ওরা চোখের ভেতর নখ বসিয়ে দেয়।

তারপর কী ঘটল কে জানে, চোখ বুজে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ টের পেলুম ইঁদুরগুলো চলে যাচ্ছে। অমনি চোখ খুলে তাকালুম। সামনে ফাটলের মুখে সম্ভবত ইঁদুরটি কাঁধে একটা প্যাকেট নিয়ে লাফ দেবার তাক করছে—কিন্তু প্যাকেটটা

ফাটলের তুলনায় বড়ো বলে আটকে যাচ্ছে।

ইচ্ছে হলো, বলি—ওরে নির্বোধ! ওরে হতচ্ছাড়া গবেট! ওটা খাবার নয়, ওটা চুরুটের প্যাকেট। ওই চুরুটের মালিক কে জানিস? প্রখ্যাত বুড়ো ঘুঘু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার! অতএব, যদি প্রাণে বাঁচতে চাস, ওটা রেখে যা। ওরে মূর্খ! তুই কোথায় ওটা লুকিয়ে রাখবি? লুকিয়েও পার পাবি? বুড়ো গোয়েন্দাপ্রবর পাতাল হাতড়ে ঠিকই উদ্ধার করে তোকে হাতকড়া পরিয়ে ছাড়বেন! সাবধান! সাবধান!

ইঁদুরটা কি আমার মনের কথা টের পেল? চুরুটের বাকসোটা রেখে ফাটল গলিয়ে চলে গেল। আমি উপুড় হয়ে আছি। এবার উঠে বসার জন্য যেই ঘুরেছি, কোমরে একটা ভারি জিনিস পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে দেখি, একটা বেঁটে খ্যাঁদানেকো মোটাসোটা লোক আমার কোমরে একটা ঠ্যাং চাপিয়ে আমার রাইফেলটা তুলে নিল।

তার চেহারা চীনাদের মতো। কিন্তু সে চীনা কিনা বোঝা কঠিন। কারণ সারা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লোকেদের এমনি চেহারা ও গড়ন। তার হাতে একটা স্টেনগান, পরনে সবজে মিলিটারি পোশাক এবং চোখে সানগ্লাস।

আমি আপত্তি করে ইংরেজিতে বললুম—এটা কী হচ্ছে? এ্যাঁ? পা সরাও বলছি।

লোকটা দাঁত বের করে হেসে দুর্বোধ্য ভাষায় কি বলল এবং পা তুলে নিয়ে আমাকে দাঁড়াতে ইসারা করল।

উঠে দাঁড়িয়ে দেখি, সে একা নয়। আরও একজন অমনি চেহারা ও পোশাকপরা সশস্ত্র লোক ক্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং চোখে বাইনোকুলার রেখে সমুদ্রের দিকে কী দেখছে।···

একটা বেঁটে খ্যাদানেকো মোটাসোটা লোক আমার কোমরে
একটা ঠ্যাং চাপিয়ে…

ছয়

নৃসিংহের গর্জন

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। এটা আমার বোকামিরই খেশারত। যদি সতর্কভাবে চারিদিকে নজর রাখতুম এবং ইঁদুরের দলে ঢুকে না পড়তুম, এই কাণ্ডটি হতো না। এখন একমাত্র ভরসা, কর্নেলরা যদি এখনই ফিরে আসেন!

তবে জানিনা, কীভাবে এদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবেন।. আমি প্রাণের আশা ছেড়ে দিলুম।

বাইনোকুলার নামিয়ে রেখে দ্বিতীয় লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে বলল—গুড মর্ণিং! আপনার নাম কি?

তার কথায় ভদ্রতার সুর আছে। জবাব দিলুম—আমার নাম জয়ন্ত চৌধুরী। আমি কলকাতার একটি দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক। আপনারা কে? কেনইবা এভাবে হামলা করছেন?

লোকটি বলল—সেকথা পরে। যা জিগ্যেস করছি, অনুগ্রহ করে তার জবাব দিন। আপনাদের সঙ্গে একজন মেডিকেল সার্জন এসেছেন, তিনি কোথায়?

বুঝলুম, ডঃ পরমেশ পুরকায়স্থের কথা বলছে। বললুম—তিনি একটু আগে বেরিয়েছেন।

ওরা দুজনে পরস্পর দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলাবলি করল। তারপর বাইনোকুলারধারী এগিয়ে এসে আমার হাতটা নিয়ে হ্যাণ্ডশেক করে বলল—যদি কোনও ত্রুটি ঘটে থাকে, অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন। আচ্ছা, আবার দেখা হবে।

বলে সে তার সঙ্গীকে ইশারা করল। সঙ্গীটি কিন্তু আমার

রাইফেলটা ফেরত না দিয়ে চলতে শুরু করল। তখন বলে উঠলুম—এ কি! আমার রাইফেল নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

দুজনেই ঘুরে একটু হাসল। কিন্তু কিছু বলল না। ক্যাম্পের ওপাশে গিয়ে চড়াইয়ে উঠল। তখন আমি পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে চেঁচিয়ে বললুম—রাইফেল না দিলে গুলি ছুড়ব বলে দিচ্ছি!

বাইনোকুলারধারী তার হাতের স্টেনগান বাগিয়ে রূঢ়কণ্ঠে বলল—মরতে সাধ থাকলে তাই করো বোকারাম!

হুঁ, ঠিকই বলেছে, ওরা দুজন, আমি একা। দুজনেরই হাতে স্টেনগান। একজনকে বড়জোর গুলি ছুড়ে কাবু করতে পারি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন স্টেনগানের গুলিতে আমার শরীর ঝাঁঝরা করে ফেলবে। অতএব চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলুম।

লোকটা স্টেনগান আমার দিকে তাক করে বলল—রিভলবার পকেটে ঢোকাও। ভদ্রলোকদের প্রতি ভদ্রব্যবহার করাই আমার রীতি।

ভালছেলের মতো রিভলবার ঢুকিয়ে দেখি, ওরা পাহাড়ের গায়ে একটা খোঁদলে আমার রাইফেলটা রাখল। তারপর বাইনোকুলার-ধারী হাসতে হাসতে বলল—তোমার মতো নির্বোধের হাতে রাইফেল থাকলে নিজেরই বিপদ ঘটাবে। তাই ওটা নিরাপদ দূরত্বে রেখে গেলাম। আমরা চলে যাওয়ার পর তুমি এসে নিয়ে যেও। কেমন?

রাগ হলেও বুঝলুম, কথাটা ঠিকই বলেছে। রাইফেলটা তখনই ফেরত দিলে হয়তো আমি ঝোঁকের বশে কী করে বসতুম, বলা যায় না।

ওরা পাহাড়ের ওপাশে অদৃশ্য হলে রাইফেলটা নিয়ে এলুম। তারপর ভাবতে বসলুম, এতক্ষণ কি একটা বিদঘুটে স্বপ্ন দেখছিলুম? কে ওরা? কেন পরমেশবাবু এসেছেন কিনা জানতে এসেছিল?

অজ্ঞাত আশংকায় বুক কেঁপে উঠল।

আর ডঃ গড়গড়িই বা কোথায় গেলেন ?

এতক্ষণ পরে মনে পড়ল, কিছু ঘটলে তিনবার বাঁশি বাজিয়ে সংকেত জানানোর কথা আছে। তাই পকেট থেকে হুইসলটা বের করে ফুঁ দিলুম। পরপর তিনবার।

তারপর দেখি, পাহাড়ের ওপর দিকে একটা চাতালের ওপর কর্নেল উঁকি দিচ্ছেন এদিকে। চোখে বাইনোকুলার। আমি ওঁকে দেখা মাত্র বাজখাঁই চেঁচিয়ে ডাকলুম—কর্নেল ! কর্নেল ! শিগগির আসুন আপনারা ! ভীষণ বিপদ !

আমার কথাগুলো বিকট প্রতিধ্বনি তুলল।

কিন্তু মিনিটের পর মিনিট কেটে গেল। ওদের আর পাত্তা নেই। কর্নেল সেই যে উঁকি মেরে অদৃশ্য হলেন তো হলেন। রাগে দুঃখে ছটফট করতে থাকলুম। অস্থিরভাবে পায়চারি করে সব দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখলুম। এখান থেকে নারকেল বনের মাথার ওপর দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। অনন্ত বিশাল জলে ফেনার ওপর সূর্যের আলো ঝকমক করে উঠছে। 'শার্ক' কোথায় অপেক্ষা করছে, দেখতে পাচ্ছি না। দিগন্তে দু' একটা কালো ঢিবির মতো পাহাড় মাঝে মাঝে ঢেউয়ের ফাঁকে ডুবছে আর ভেসে উঠছে। আর ডাইনে দূরে এই দ্বীপের খাড়ির ওপর অজস্র সামুদ্রিক পাখি ওড়াউড়ি করছে। তাদের তীক্ষ্ণ চিৎকার হাওয়ায় ভেসে আসছে।

সবচেয়ে খারাপ লাগছে, আমাদের খাদ্য ভাণ্ডারটি লুঠপাঠ হওয়ার কথা ভেবে। কপালে কর্নেলের বকুনি তো আছেই। আমি দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারিনি। অতএব কর্নেলের ওপর রাগ করা আমার সাজে না।

প্রায় একটি অস্থির ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর কর্নেলরা ফিরলেন।

আমি প্রায় এক নিঃশ্বাসে পুরো ঘটনা জানিয়ে দিলুম। ওঁরা

তিনজনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর কর্নেল বললেন —হুম্! তাহলে ডঃ গুটেনবার্গ, বোঝা যাচ্ছে আমার ধারণায় কোনও ভুল নেই। এ নিশ্চয় টংকু আরেগোনার দল না হয়ে যায় না। কিন্তু ওরা পরেমশবাবুর সম্পর্কে এত আগ্রহী কেন?

পরমেশবাবু ভয় পেয়েছেন মনে হল। মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ডঃ গুটেনববার্গ বললেন—আচ্ছা ডঃ পুরকায়স্থ, আপনি তো একবার ভিয়েনায় বিশ্ব চিকিৎসাবিজ্ঞানী সম্মেলনে বলেছিলেন, হৃদ্‌যন্ত্র যেমন বদল করা যায় শরীরে, তেমনি মাথাও বদল করা যায়!

পরমেশবাবু বললেন—হ্যাঁ। এ ব্যাপারে কিছুটা পরীক্ষা করে দেখার পরই ওই সিদ্ধান্তে এসেছিলুম। ধরুন, দুর্ঘটনার ফলে কারও মাথায় আঘাত লাগল এবং পরিণামে মস্তিষ্কের রোগ দেখা দিল। কিংবা মনে করুন, আগের সব কথা সে ভুলে গেল। সেক্ষেত্রে তার মস্তিষ্ক বদল সম্ভব। তবে মানুষের বেলায় কিন্তু মুশকিলটা কী হবে জানেন? সুস্থ মস্তিষ্ক পাওয়া যাবে কোথায়? রামের মাথায় আঘাত লেগে মগজ বিগড়েছে বলে শ্যাম তো নিজের মগজ দান করতে যাবে না। কারণ তার মানে তাকে মরতে হবে! অবশ্য একটা উপায় আছে। কোনও সদ্যমৃত মানুষের মস্তিষ্ক ব্যবহার করা যায়। কিন্তু তাইবা তার আত্মীয়রা দিতে চাইবেন কেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—এই মগজ বদল নিয়ে উপভোগ্য গল্পের বই আছে। যাক্‌গে, পরমেশবাবু, আপনার পরীক্ষার কথা বলুন।

পরমেশবাবু বললেন—আমি একটা কুকুরের মগজ বদল করে-ছিলুম। দুটো কুকুরই দুর্ঘটনায় মারা পড়েছিল। একটার মাথা অক্ষত ছিল, অন্যটার মাথা ট্রাকের চাকার ধাক্কায় জখম হয়েছিল। আমি দ্বিতীয় কুকুরটার মাথা অপারেশান করে প্রথম কুকুরটার মগজ বসিয়ে দিয়েছিলুম।

কর্নেল আগ্রহে বললেন—তারপর, তারপর ?

—কুকুরটা ঘণ্টা দশেক বেঁচে ছিল। তারপর মারা যায় ফের। তবে দেখুন, শুধু মগজ কেন, মানুষ হয়তো একদিন পুরো মাথাই বদলাতে পারবে। উদোর মাথা বুধোর ঘাড়ে বসিয়ে দেবে! কেন? আমাদের পৌরাণিক গল্পে গণেশের মাথার আশ্চর্য কাহিনী ভুলে যাচ্ছেন ? শনির দৃষ্টি লেগে গণেশের মাথাটি উড়ে গেল। তখন ঐরাবতের মাথা কেটে এনে জোড়া দেওয়া হলো। গণেশের মাথাটি তাই হাতির। আমার কেমন যেন সন্দেহ, প্রাচীন ভারতের শল্য চিকিৎসকরা সম্ভবতঃ এসব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। তা না হলে এমন কাহিনীর অর্থ কী ?

ডঃ গুটেনবার্গ বললেন—আমি কিন্তু ওটা কাহিনী বলে মনে করিনে। ওটা একটা প্রকৃত ঘটনা।

কর্নেল বললেন—কেন বলুন তো ?

ডঃ পুরকায়স্থের বাবা এই দ্বীপে দশাবতার ফলক কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। এই দ্বীপেই আমরা নৃসিংহের মতো বিচিত্র প্রাণীর দেখা পেয়েছি—যার মূর্তি ওই ফলকে ছিল এবং সম্প্রতি চুরি গেছে।

—আপনি কী বলতে চান ডঃ গুটেনবার্গ ?

—ধরুন, এই প্রাচীন অধিবাসীরা শল্যবিদ্যায় এত দক্ষ ছিল যে তারা মানুষের ধড়ে সিংহের মুণ্ডু বসিয়ে ওই নৃসিংহ নামক প্রাণী সৃষ্টি করতে পেরেছিল এবং সেই নৃসিংহের বংশধরকে আমরা দেখতে পেয়েছি।

—বেশ। তাই মানলুম। তারপর ?

—কে বলতে পারে, ওই দশাবতার ফলকে নৃসিংহ মূর্তিটির মধ্যেই শল্যবিদ্যার সেই রহস্যময় পদ্ধতি সাংকেতিক ভাষায় দ্বীপ-বাসীরা রেখে গেছে কি না !

—আপনার কথায় যুক্তি আছে। বলে যান ডঃ গুটেনবার্গ !

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি যে কুখ্যাত টংকু আরেগোনার দলের কথা বললেন—যারা দেশবিদেশের চোরাই প্রত্নদ্রব্যের কারবার করে—তারা কোনও সূত্রে দশাবতার ফলকরহস্য টের পেয়ে গেছে এবং সেটি হাতিয়েছে ডঃ পুরকায়স্থের বাড়ি থেকে।

এবার পরমেশবাবু ভয়ে-ভয়ে বললেন—ওরা আমাকে খুঁজছে কেন?

ডঃ গুটেনবার্গ একটু হেসে বললেন—হয়তো ওদের ধারণা হয়েছে, আপনি দশাবতার ফলকে নৃসিংহ মূর্তির মধ্যে সাংকেতিক লেখাগুলোর রহস্য টের পেয়েছেন এবং তাই সেই পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। অতএব আপনি ওদের জন্য নৃসিংহ সৃষ্টি করে দেবেন।

আমি অবাক হয়ে বললুম—ওরা নৃসিংহ নিয়ে করবেটা কী?

জবাবটা দিলেন কর্নেল। হাসতে হাসতে বললেন—জয়ন্ত, নৃসিংহের চেয়েও বিচিত্র প্রাণী এই মানুষ। সবাইকে তাক লাগিয়ে কিছু করতে পারলে সে আর কিছু চায় না। বিশেষ করে টংকু আরেগোনা শুনেছি খুব খামখেয়ালী লোক। সে হয়তো ভেবেছে, এরপর নৃসিংহ-চালানী কারবার ফেঁদে বসবে।

—কী কাণ্ড! কিনবেটা কে?

—কেন? সার্কাস কোম্পানীগুলো কিনবে। আর কিনবে সারা বিশ্বের সব চিড়িয়াখানা।

ডঃ গুটেনবার্গ বললেন—আপনার কথায় তামাসার সুর থাকলেও সত্যি হতে পারে।

কর্নেল বললেন—আলবাৎ পারে। টংকু আরেগোনা খুব খামখেয়ালী লোক। একবার তার মাথায় কিছু ঢুকলে তাই নিয়ে পাগল হয়ে যায়। সিঙ্গাপুরে তার কিউরিও শপে একবার আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আরেগোনা কথাটা যে আসলে অর্জুন, তার কাছেই শুনেছি। সে খুব গর্ব করে বলেছিল—জানেন কর্নেল?

আমার পূর্বপুরুষরা ভারতেরই লোক।

এবার আমি বললুম—কিন্তু কর্নেল, আপনারা তো দিব্যি গপ্পগাছা চালাচ্ছেন—এদিকে ডঃ গড়গড়ি বেচারার কী হল, খুঁজে দেখা উচিত নয় কি?

কর্নেল হো হো করে হেসে উঠলেন। আমি তো অবাক।

ডঃ গুটেনবার্গ বললেন—জয়ন্তবাবু, ডঃ গড়গড়ির জন্য ভাববেন না।

—সে কী!

—উনি আপনাকে বোকা বানিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন আসলে। ওঁর পদস্খলন এবং পতন একটা চালাকি।

—তার মানে?

কর্নেল বললেন—ডার্লিং! ডঃ হরিহর গড়গড়ি বহাল তবিয়তে কলকাতায় রয়েছেন। ডঃ গড়গড়ি আমার কাছে গিয়েছিলেন নৃসিংহের ছবি নিয়ে, তিনি—অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে যিনি এসেছিলেন স্রেফ নকল ডঃ গড়গড়ি। আমারই পরামর্শে ডঃ গুটেনবার্গ ওকে জাল জেনেও অভিনয় চালিয়ে যান।

—অসম্ভব! ডঃ গড়গড়িকে আমি চিনি! আমার ভুল হতে পারে না। আমি ওকে একবার

—বৎস জয়ন্ত, কবে একবার দেখেছ এবং সম্ভবত এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় দূর থেকে বক্তৃতা নোট করেছ—তাই দিয়ে কিছু প্রমাণ হয় না।

—কিন্তু চেহারা তো মনে আছে। ধরে নিচ্ছি, মাইক্রোফোনে আসল কণ্ঠস্বর না হয় ধরা যায় নি।

—হুঁ, এই নকল লোকটি আসল লোকের মতো দেখতে, এই যা।

—ওরে বাবা! বলেন কী! এই জাল গড়গড়ি লোকটা কে তাহলে?

—লালবাজারের গোয়েন্দাকর্তা আনোয়ার খানের কাছে পরমেশ-বাবুর সেই ঠাকুরমশাই সব কবুল করেছেন। ফলক চুরি ঠাকুর-মশাই করেছিলেন জাল গড়গড়ি অর্থাৎ শ্রীযুক্ত বনবিহারী রায়ের টাকা খেয়ে। এই রায়মশাই একজন কুখ্যাত চোরাচালানী পাণ্ডা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও হংকং থেকে প্রচুর জিনিস চোরাচালানে ভারতে যায়। সেই সূত্রে টংকু আরেগোনার সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ ছিল।

—যাক গে। প্রচুর জ্ঞান হলো। কিন্তু বনবিহারী নৃসিংহের ছবি পেল কোথায়?

—ডঃ গুটেনবার্গ যখন নার্সিং হোমে ছিলেন, ওর পার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাট থেকে ছবিটা চুরি গিয়েছিল। পরে যখন সে ডঃ গড়গড়ি সেজে আমাদের দলে ভিড়ল, ডঃ গুটেনবার্গ তাকে দেখে অবাক। আমি ওকে পরামর্শ দিলুম, চেপে যান। তবে বনবিহারী এ রিস্ক নিয়েছিল, কারণ তার চেহারা অবিকল ডঃ গড়গড়ির মতো। তাছাড়া সে ভেবেছিল, সাহেবদের এ ব্যাপারে ঠকানো সোজা।

একটু রাগ দেখিয়ে বললুম—তাহলে গোড়া থেকেই সব জানতেন অথচ আমাকে কিছু বলেননি। বললে আমি নজর রাখতুম ওর দিকে। অন্তত ডঃ গুটেনবার্গও যদি একটু আভাস দিতেন।

কর্নেল আমার একটা হাত নিয়ে আদর করে বললেন—বৎস জয়ন্ত! বেশি জানলে মাথার ঠিক থাকে না। মাঝে মাঝে মানুষের যত কম জানা হয়, তত মঙ্গল। যাক গে, তুমি অনেক হেনস্থা হয়েছ মানুষ ও ইঁদুরের হাতে। এবার একটু বিশ্রাম করো। আর আসুন পরমেশবাবু, আসুন ডঃ গুটেনবার্গ! আমরা শাবল গাঁইতিতে হাত লাগাই। বদমাস লুঠেরা ইঁদুরদের গর্ত থেকে লুঠের মালগুলো উদ্ধার করা যাক। নৈলে কিছু খেতে পাব না।

তিনজনে শাবল ও গাঁইতি নিয়ে পাথরের চাতালে সেই ফাটলটার কাছে গেলেন। এবং হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে বড় বড়

পাথরের টুকরো ওপড়াতে শুরু করলেন।

তারপরই তখনকার মতো বিদঘুটে দৃশ্য দেখা গেল। ইঁদুরগুলোর সঙ্গে তিনটি মানুষের জব্বর লড়াই বেধে গেল। তিনজনেই শাবল ও গাঁইতি চালিয়ে প্রচণ্ড পরাক্রমে ইঁদুরদের নিধনযজ্ঞে মেতে উঠলেন। বেগতিক দেখে বেচারারা কোথায় গা ঢাকা দিল শেষমেষ।

সাতটা ইঁদুর হত। লেজ ধরে নীচে ছুড়ে ফেলা হলো। আহত-গুলো কোনরকমে পালিয়ে গেল। আমি ক্যাম্পখাটে শুয়ে ব্যাপারটা খুব উপভোগ করলুম। কিছুক্ষণ পরে উদ্ধারকরা টিন-গুলোর মুখ কেটে সবে সবাই খেতে বসেছি, হঠাৎ পাহাড়ের ওপর দিকে অমানুষিক জান্তব গর্জন শুনে চারজনে আঁতকে উঠলুম।

সেই ভয়ঙ্কর গর্জনের কোনও তুলনা হয় না। যেন একশোটা সিংহ একসঙ্গে আকাশ ফাটিয়ে পাহাড় কাঁপিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছে।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্তভাবে বললেন—চলে আসুন সবাই! নৃসিংহ ফাঁদে পড়েছে!

সাত

নৃসিংহ, না গরিলা?

আগেই বলেছি, দ্বীপটা সমুদ্র থেকে একটা পিরামিডের মতো মাথা তুলেছে এবং তার গায়ে আগাগোড়া ঘন জঙ্গল—কোথাও কোথাও ন্যাড়াপাথর আছে এই যা।

নৃসিংহের ফাঁদের কাছে পৌঁছতে প্রায় পাঁচশো ফুট চড়তে হলো। ঢালু বলে তত কষ্ট হলো না। সমুদ্রতল থেকে আন্দাজ আটশো ফুট উঁচুতে বলে সব সময় প্রচণ্ড জোরে ঝোড়ো হাওয়া বইছে। কিন্তু এখানে উঁচুউঁচু গাছের জঙ্গল রয়েছে। ফাঁদটা পাতা হয়েছে সেই

জলপ্রপাতের দিকে। ফাঁদ মানে একটা গভীর গর্তের মধ্যে শক্ত স্প্রিং দেওয়া জাঁতাকল। গর্তের ভেতরটা অন্ধকার। সেখান থেকে মুহূর্মুহু গর্জন করছে প্রাণীটা। কানে তালা ধরানো সেই গর্জন। হৃদপিণ্ডে খিল ধরে যাবার যোগাড় হচ্ছে আমার। গোটা পাহাড়টা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। কর্নেল ব্যস্তভাবে বললেন—ডঃ গুটেনবার্গ! এবার আর দেরী না করে আপনার ঘুমপাড়ানী গুলি ছুড়ুন।

ডঃ গুটেনবার্গ ওর রিভলবারের নলের মুখে একটা ইঞ্জেকশানের শিরিঞ্জ এঁটে ট্রিগার টিপলেন। হিস্ করে একটা শব্দ হলো।

প্রায় পাঁচমিনিট পরে গর্জনের স্বর কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে মনে হলো। আরও দু'মিনিট কেটে গেল। তারপর প্রাণীটার আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

কর্নেল বললেন—আসুন, এবার গর্তে নেমে প্রাণীটাকে ভাল করে দেখা যাক। জয়ন্ত, তুমি চারদিকে নজর রেখে পাহারা দাও। সাবধান, এবার আর বোকামি করো না।

আমি বেজার মুখে বললুম—নৃসিংহ দেখার ইচ্ছে বুঝি আমার নেই?

কর্নেল হেসে বললেন—দেখবে বৎস, দেখবে। প্রাণভরে দেখতে পাবে। কীভাবে ওকে টেনে তুলব, আগে দেখে আসতে দাও।

ওঁরা তিনজনে গর্তের ধারের পাথর আঁকড়ে নামতে থাকলেন। গর্তটা খুব গভীর এবং প্রকাণ্ড। এ গর্ত কোন আদিম যুগে ভূমিকম্পের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে হয়তো। চারধারে ঘন ঝোপ ও গাছ থাকায় হঠাৎ কারও নজরে পড়া সম্ভব নয়। গর্তের মুখের ওপর অনেকটা জায়গা জুড়ে ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে। তাই বেচারা নৃসিংহ আচমকা···

আমার ভাবনা বাধা পেল। না—আচমকা নয়। গর্তের এধারে অনেকগুলো সেই রাক্ষুসে ইঁদুরের টোপ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে দেখতে

পেলুম। ও হরি! তাহলে নৃসিংহ এইসব ইঁদুর কড়মড়িয়ে খেয়েই বেঁচে আছে। একেকটা ইঁদুরের ওজন কমপক্ষে দু'আড়াই কিলোর কম নয়। কটা খেলে ওর পেট ভরে কে জানে।

ইঁদুরের লোভেই বেচারা হুড়মুড় করে এসে ফাঁদে পড়েছে। নিশ্চয় ওর এই খাদ্যের ব্যাপারটা ডঃ গুটেনবার্গ জানতেন।

এই সময় হঠাৎ আমার চোখ গেল এই দ্বীপ পাহাড়ের পূর্বে—সমুদ্রের দিকে।

দেখি, একটা ছোট্ট স্টীমবোট ঢেউয়ে দুলছে। স্টীমবোটের গড়ন একটা লম্বাটে মাকুর মতো। ওতেই কি টুংকু আরেগোনা বা অর্জুনের লোকেরা এসেছে? দেখে মনে হলো, বোটটা অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

আমি বোটের দিকে নজর রেখেছি, এমন সময় আমার পিছনে কোথাও একটা শব্দ হলো। সম্ভবত একটা পাথর গড়াতে গড়াতে পড়ল। অমনি ঘুরে দাঁড়ালুম।

এক পলকের জন্য দেখলুম, ওপরে গাছপালার মধ্যে একটা বড় পাথরের আড়ালে ডঃ গড়গড়ির মুখটা সাঁৎ করে সরে গেল। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—হ্যালো বনবিহারীবাবু!

অমনি আমার দুপাশে দুমদাম আওয়াজ করে কেউ গুলি ছুড়ল। একলাফে গর্তের ধারে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ডাকতে থাকলুম—কর্নেল! কর্নেল!

ভেতর থেকে গমগমে আওয়াজে কর্নেলের সাড়া এল—কী হয়েছে জয়ন্ত?

—বনবিহারী গুলি ছুড়ছে।

—তুমি গুলি ছুড়ে বসোনা তাই বলে। সাবধান।

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম—ভাল বলেছেন বটে! আমি ··

আমাকে থামিয়ে দিয়ে মাথার ওপরকার পাথরের চটা ছাড়িয়ে ফের বনবিহারীর গুলি কুচ্ছিত আওয়াজ দিল। সঙ্গে সঙ্গে গর্তে

ঝাঁপ দিলুম।

তারপর পড়েছি একটা নরম বা শক্ত জান্তব কিছুর ওপর। নাকি ঘাসের জঙ্গলে? টর্চ জ্বলে উঠল। কর্নেল বললেন—সরে এস জয়ন্ত। তুমি বেচারার পেটের ওপর পড়ে আছ।

তাকিয়ে দেখেই আঁতকে সরে গেলুম।

গর্তটা ভেতরে খুব চওড়া। মধ্যিখানে দু'পা ছড়িয়ে ফাঁদের স্প্রিংয়ে মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে আছে একটা দানবাকৃতি প্রাণী। শরীরটা বিশাল গরিলার মতো—কিংবা লোমওয়ালা মানুষেরই মতো—কিন্তু মাথাটা সিংহের মতো। বড় বড় দাঁত ছরকুটে চোখ বুজে কাঠ হয়ে আছে। মাথাটা ঢাকের মতো বড়। ঘন ধূসর রঙের কেশরে ঢাকা। দুই পায়ের গোড়ায় স্প্রিংয়ের দাঁত আটকে রয়েছে। স্প্রিংয়ের পাতের সঙ্গে একটা মোটা লোহার শেকল কোণের দিকে লোহার গোঁজে আটকানো আছে। ফাঁদটা চমৎকার পাতা হয়েছিল বটে।

টর্চের আলো নিভিয়ে কর্নেল বললেন—নৃসিংহ দর্শন হল তো জয়ন্ত?

—হল। কিন্তু ওপরে বনবিহারী যে ওৎ পেতে আছে!

—থাক্। আমরা ওপরে আর উঠছি না।… বলে কর্নেল পরমেশ-বাবুর দিকে ঘুরে বললেন—তাহলে আপনি বলতে চান, যাকে আমরা নৃসিংহ বলছি—তা আসলে মালয় দ্বীপপুঞ্জের অধুনালুপ্ত একজাতের গরিলা ছাড়া কিছু নয়?

পরমেশবাবু বললেন—আমার তাই অনুমান। প্রাণীবিজ্ঞান আমাকে পড়তে হয়েছে। সেই জ্ঞানমতেই একথা বলছি। অবশ্য সিংহের মাথা মানুষের শরীরে জোড়া দেওয়া বিজ্ঞানের তত্ত্বের দিক থেকে সম্ভব হতেও পারে। কিন্তু এ প্রাণী গরিলা ছাড়া আর কিছু নয়। যেটা আপনারা সিংহের কেশর ভাবছেন, ওটা গরিলারই চুল। মালয় দ্বীপপুঞ্জ এলাকার গরিলাদের মাথায় মানুষের মতো

চুল ছিল। আর ওর চোয়াল লক্ষ্য করুন। সিংহের চোয়ালের সঙ্গে কোনও মিল নেই। দাঁতের গড়ন দেখুন। প্রত্যেকটা দাঁত সমান। মানুষের মতো চোয়ালের দাঁতগুলো ভোঁতা। এ একটা গরিলাই বটে

ডঃ গুটেনবার্গ বললেন—তা হোক। তবু এও একটা বিস্ময়কর আবিষ্কার বই কি।

কর্নেল বললেন—তা আর বলতে! যাক্ গে, এর ঘুম অন্তত পাঁচ ঘণ্টা ভাঙবে না। এর মধ্যে একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। চলুন, আমরা বেরিয়ে পড়ি। তারপর…

আমি বাধা দিয়ে বললুম—বেরুবেন কীভাবে? ওপরে বন-বিহারীরা তাক করে আছে।

কর্নেল বললেন—এস তো আমার সঙ্গে। ঠিক বেরিয়ে যেতে পারবে নিরাপদে। ততক্ষণে ভেতরের অন্ধকার অতটা মালুম হচ্ছে না। এর কারণ আবিষ্কার করে খুশিতে নেচে উঠলুম। সামনে দেয়ালের প্রকাণ্ড ফাটল দিয়ে আবছা আলো আসছে। সে পথে আমরা সার বেঁধে এগিয়ে চললুম। কিছুক্ষণ পরে সুড়ঙ্গপথ থেকে বেরিয়ে দেখি, জলপ্রপাতের কাছে এসে পৌঁছেছি। কর্নেল বললেন —তখন ফাঁদ পাততে এসে এই পথটা দেখে গিয়েছিলুম। তবে এদিক দিয়ে সেই বাঁচে পৌঁছতে অনেক মেহনত হবে এই যা মুশকিল।

দুর্ভাবনায় মুষড়ে গিয়ে বললুম—অন্যপথ জানা আছে তো?

কর্নেল বললেন—এস তো, দেখা যাক। ডঃ গুটেনবার্গ যখন পথপ্রদর্শক, চিন্তার কারণ নেই।

ডঃ গুটেনবার্গ দাড়ি চুলকে বললেন—আমি এদিকটা বিশেষ চিনি না। সেবার এই উত্তর দিকটায় ঘোরাঘুরির ফুরসৎ পাইনি।

এই সময় হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, পুবের খাড়িতে সেই মোটর বোটটার কথা। বললুম—কর্নেল! ভুলে গিয়েছি বলতে।

ওদিকে একটা মোটর বোট দেখেছিলাম তখন। মাকুর মতো লম্বাটে গড়ন।

কর্নেল বললেন—টর্পেডোবোট? তারপর ঘুরে চোখে বাই-নোকুলার রাখলেন।

সবাই ঘুরে দাঁড়ালুম। কর্নেল বোটটা দেখার পর বললেন—তাহলে কি টংকু আরেগোনা স্বয়ং এ দ্বীপে এসে জুটেছে? ব্যাপারটা কী?

পরমেশবাবু গম্ভীর মুখে বললেন—আর তার লোক আমার কথাই বা কেন জিগ্যেস করে গেল জয়ন্তবাবুকে?

কর্নেল বললেন—একটা সূত্র আমার মাথায় এসেছে।

আমরা সবাই একসঙ্গে বললুম—কী, কী?

কর্নেল বললেন—বনবিহারীর বাসায় আনোয়ার খান, মানে লালবাজার গোয়েন্দা দফ্‌তরের সেই কর্তা ভদ্রলোক হামলা করেছিলেন। কিছু কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছিল। তাতে দেখা যায়, বনবিহারী সিঙ্গাপুরের একটা লোককে খুব পুরনো একটা দুষ্প্রাপ্য মূর্তি বেচতে চেয়েছিল—তার জবাবে সিঙ্গাপুরের লোকটি লিখেছে, ওসব আমি বিশ্বাস করি না। হাতেনাতে প্রমাণ চাই। অতএব আপনি টোরা আইল্যাণ্ডে গিয়ে সব প্রমাণ হাতেনাতে দেবেন, তাতে আমি রাজী আছি। প্রমাণ পেলে মূর্তিটা পাঁচলক্ষ ডলারে কিনব। আপনি টোরাদ্বীপে আসুন—যে ভাবে পারুন।

ডঃ গুটেনববার্গ বললেন—অতএব বোঝা গেল, ডঃ গড়গড়ি সেজে পরমেশবাবুর ফলকের নৃসিংহ ছবিটা নিয়ে সে আমাদের সঙ্গে টোরাদ্বীপে কেন এসেছে!

আমি বললুম—একা আসতে পারত না? এত রিস্ক নিয়ে এল কেন? বিশেষ করে ডঃ গুটেনবার্গের কাছে ধরা পড়া সম্ভব ছিল।

কর্নেল বললেন—একা তার পক্ষে আসা অসম্ভব। আরেগোনা বিরাট লোক। সে পারে বলে কি অন্য কেউ এই দুর্গম দ্বীপে আসতে

পারে? তাই সে ডঃ গড়গড়ি সেজে আমাকে উৎসাহিত করে দ্বীপে আসার সুযোগ নিয়েছে। তাছাড়া ওই যে 'হাতেনাতে প্রমাণ' কথার অর্থও বোঝা যাচ্ছে। সত্যি সত্যি নৃসিংহ-জাতীয় প্রাণী এখানে আছে। কাজেই আমার ধারণা, কোনও সূত্রে ভারতীয় সরকারী সমীক্ষকদলের অভিযান ও নৃসিংহের হাতে মর্মান্তিক পরিণতির কথা বনবিহারী জানতে পেরেছিল। জেনে সে আরও লোভে অস্থির হয়ে উঠেছিল। সত্যিসত্যি নৃসিংহ দেখাতে পারলে আরেগোনা বিশ্বাস করবে যে সত্যি নৃসিংহ-মূর্তিতে সেই প্রাচীন শল্য চিকিৎসা পদ্ধতির কথা সাংকেতিক ভাষায় লেখা আছে।

বললুম—তাহলে পুরো দশাবতার হাতালেই পারত বনবিহারী। কেন শুধু নৃসিংহ মূর্তির অংশটা খুবলে তুলে নিয়েছে?

কর্নেল বললেন—আরেগোনা ধূর্ত। সে দশাবতার চেনে। পুরো ফলকটা দেখলে তার সন্দেহ হবে যে এটা সাধারণ একটা দশাবতার ফলক। নৃসিংহ মূর্তিটা আলাদা থাকলে অন্য অর্থ দাঁড়ায় না কি? তখন একটা নৃসিংহের পুরাতাত্ত্বিক তাৎপর্য আরও গভীর হয়ে ওঠে। বুঝেছ?

বললুম—তাহলে প্রাচীন শল্য চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যাপারটা বনবিহারীর গুল?

কর্নেল জবাব দিলেন—স্রেফ গুল। পরমেশবাবু প্রাণীটাকে গরিলা বললেন। হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে, ওইরকম একটা প্রাণীর কথা আমি একটা বইয়ে পড়েছিলুম বটে।

কথা বলতে বলতে আমরা সেই নারকেল বনটার কাছে নেমে গেলুম। আর পথ চিনতে কোনও ভুল হলো না।

ক্যাম্পে গিয়ে একেবারে শটান গড়িয়ে পড়লুম ক্যাম্পখাটের ওপর। শরীর ভীষণ ক্লান্ত।...

আট

বনবিহারী বনাম আরেগোনা

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, তখন প্রায় দুটো বাজে, কর্নেল ও ডঃ গুটেনবার্গ ইয়া মোটা নাইলনের রশিটা গোছাতে শুরু করলেন। ব্যাপার কী? গরিলাটাকে বেঁধে ফেলা হবে বুঝি? কিন্তু আনা হবে কীভাবে, বুঝতে পারলুম না।

পরমেশবাবু খুঁতখুঁতে গলায় বললেন—ওর গায়ে অসম্ভব জোর আছে।

কর্নেল বললেন—গায়ের জোরে কিছু হয় না, ডঃ পুরকায়স্থ: আপনি তো প্রাণী বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ। আপনি তো জানেন, আসল জোরটা মস্তিষ্কের। সেই জোর আছে বলেই মানুষ টিকে থেকে সব জোরওয়ালা প্রাণীর ওপর প্রভুত্ব করছে।

কিন্তু ওকে আনবেন কেমন করে?

ডঃ গুটেনবার্গ বললেন—আষ্টেপিষ্টে এই দড়ি জড়িয়ে ওকে মমীর মতো লম্বা করে ফেলব এবং তার আগে একটা ঘুমের ইঞ্জেকশান অবশ্যই দেব।

তারপর? ওটার ওজন তো কমপক্ষে দুই কুইন্টালের কম নয়।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—চারজনের ভাগে কত ওজন পড়বে? মাথা পিছু পঁচিশ কিলোগ্রাম। কি জয়ন্ত? খুব বেশি ওজন কি? ভবে ভেবো না। স্ট্রেচার বানিয়ে নেব। জঙ্গলে প্রচুর কাঠ আছে।

পাহাড়ী ঢাল বেয়ে ওই প্রকাণ্ড প্রাণী মড়ার মতো খাটে বয়ে আনার কথা ভেবে মোটেও স্বস্তি পেলুম না।

আমার মনের কথা যেন আঁচ করে কর্নেল আরও হেসে বললেন

—জয়ন্ত! পাহাড়ে চড়ার চেয়ে নামা সোজা। ভাবনার কারণ নেই ডার্লিং। স্ট্রেচারে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নামানো অতি সরল ব্যাপার। না, না—সত্যি সত্যি তোমায় কাঁধে করে বইতে হবে না। টোরাদ্বীপের এটাই মজা।

একটু পরে সবাই মিলে বেরিয়ে পড়লুম আগের পথে। চড়াই ভেঙে পিঠে রোদ নিয়ে উঠতে কষ্ট যা হবার হচ্ছিল। কিন্তু উপায় নেই। ক্যাম্পে আর একা থাকার সাহস আমার নেই—নৈলে বরং একটা ঘুম দিয়ে নিতুম।

ফাঁদের গর্ত যেখানে, তার কাছাকাছি একটা পাথরের দেয়াল খাড়া উঠে গেছে।

দেয়ালের নীচে ঝোপ জঙ্গল ঘন হয়ে আছে। যেই সেখানে পৌঁছেছি, হঠাৎ ঝোপ থেকে চারটে বেঁটে মিলিটারী পোশাকপরা লোক সামনে লাফ দিয়ে দাঁড়াল।

প্রত্যেকের হাতে স্টেনগান বা রাইফেল। চোখে সানগ্লাস। মাথায় গোল টুপি। সেই লোকদুটোও রয়েছে ওদের মধ্যে—যারা আমাকে হেনস্থা করেছিল।

আমাদের সঙ্গে রাইফেল আছে। কিন্তু কর্নেল সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় বললেন—বাধা দিও না।

সেই বাইনোকুলারধারী একটু হেসে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলল—ডঃ পরমেশ কে?

পরমেশ কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন—আমি।

লোকটা এগিয়ে এসে বলল—আমরা বন্ধু। কারও কোনও ক্ষতি করতে চাইনে। আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে আসুন। দলপতি আপনাদের সাক্ষাৎপ্রার্থী। বিশেষ করে ডঃ পরমেশের সঙ্গে তিনি কথা বলতে চান।

আমরা ওকে অনুসরণ করলুম। পিছনে তিনজন অস্ত্র তাক করে আসতে থাকল। খুব অপমানজনক অবস্থা। কিন্তু এখন লড়াই

করা মানে অকারণ প্রাণটি খোয়ানো।

কিছুটা যাওয়ার পর একটা সুড়ঙ্গ পথে আমাদের ঢুকতে হলো। ঘন অন্ধকার। ওরা সামনে ও পেছনে টর্চ জ্বেলে আমাদের নিয়ে চলল।

এক সময় অবাক হয়ে দেখলুম, আমরা একটা সুড়ঙ্গপথে সেই ফাঁদের গর্তের তলায় এসে গেছি। ফাঁদে আটকানো গরিলাটা এখনও তেমনি ঘুমিয়ে আছে।

আর একপাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা মোটা গাব্দা গোব্দা লোক। তার চুল সাদা। কিন্তু মুখে দাড়ি গোঁফ নেই। থ্যাবড়া নাক। সে আমাদের দেখে চমৎকার হিন্দীতে বলে উঠল—আইয়ে, আইয়ে! হাম আপলো-গোঁকা ইন্তেজার কার্ রাহা। লেকিন হেঁয়াপর বইঠনেকা জায়গা নেহি হ্যায়। মাফ কিজিয়ে!

অন্য পাশে কাঁচুমাচু মুখে বসে আছে সেই জাল ডঃ গড়গড়ি—ওরফে বনবিহারী।

কর্নেল হাত বাড়িয়ে বললেন—হ্যালো মিঃ টংকু আরেগোনা!

আরেগোনা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে হাত বাড়াল—হ্যালো কর্নেল-সাহাব! কেতনা বরষ বাদ আপকা সাথ মিল্‌তা হ্যায়।

কিছুক্ষণ এইসব সম্ভাষণ ও আলাপ হলো। তারপর আরেগোনা বলল—ডঃ পরমেশ কে?

পরমেশবাবু বললেন—আমি।

আরেগোনা তাঁকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলল—আরে পুরকায়স্থ সাহেব! আপনার বাবা মেজর সাহেবের সঙ্গে আমার দোস্তি ছিল। উনি যখন সিঙ্গাপুরে ছিলেন, তখন খুব ভাব ছিল আমাদের। তো এবার কাজের কথাটা সেরে নিই।

বলে আরেগোনা বনবিহারীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে শুরু করল—এই লোকটা আমাকে ধাপ্পা দিচ্ছে, না সত্যি কথা বলছে আমি এখনও জানি না। ও আমাকে একটা পাঁচ হাজার বছরের

পুরনো মূর্তি বেচতে চায়। সেই মূর্তির গায়ে নাকি সাংকেতিক ভাষায় লেখা আছে ··

পরমেশবাবু বাধা দিয়ে বললেন—স্রেফ মিথ্যে কথা। ওটা একটা দশাবতার ফলক থেকে খুবলে নেওয়া মূর্তি। আমার বাবা ফলকটা এই দ্বীপে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।

আরেগোনা দ্রুত বলে উঠল - সেই কথাই আমার মাথায় এসেছিল। মেজর সাহেব আমাকে দশাবতার ফলকটা দেখিয়ে-ছিলেন। তাই যখন বনবিহারী আমাকে নৃসিংহ মূর্তির ফোটো পাঠিয়ে দিল, আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল। তাই খোঁজ খবর নিতে শুরু করলুম। পরে আমার কলকাতার এজেন্ট খবর দিল, মেজর সাহেব বেঁচে নেই। তাঁর ছেলেও বড় ডাক্তার। এবং দশাবতার ফলকটা চুরি গেছে ওদের বাড়ি থেকে। তখন এই বনবিহারীর ওপর সন্দেহ বেড়ে গেল। এই সময় জানতে পারলুম, টোরা আইল্যাণ্ডে নাকি নৃসিংহের হাতে কয়েকজন ভারতীয় বিজ্ঞানী মারা পড়েছেন। তারপর বনবিহারীও লিখে পাঠাল যে টোরা আইল্যাণ্ডে সত্যি নৃসিংহ আছে এবং সে আমাকে স্বচক্ষে দেখাতে পারবে, তখন ভাবলুম, তাহলে বনবিহারী হয়তো কোনওভাবে টের পেয়েছে। নৃসিংহ মূর্তির গায়ে সাংকেতিক ভাষায় প্রাচীন শল্য চিকিৎসার ফরমুলা লেখা আছে। হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করে ফেললুম সব কিন্তু ··

বনবিহারী বলে উঠল—তাহলে আর অবিশ্বাসের কারণ কী? ওই তো নৃসিংহ পড়ে আছে আপনার সামনে। এই দ্বীপের লোকেরাই মানুষের মাথায় সিংহের মাথা কেটে বসিয়ে নৃসিংহ তৈরি করেছিল। তাই দশাবতার ফলক এখানেই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন পরেমশবাবুর বাবা।

আরেগোনা বলল—কিন্তু প্রাণীটাকে দেখে আমার যে সন্দেহ হচ্ছে ব্রাদার!

—কী সন্দেহ ?

—ওটা কি সত্যি নৃসিংহ ?

নৃসিংহ মূর্তিটা বনবিহারী কোটের পকেট থেকে বের করে বলল —মিলিয়ে দেখুন।

—মিলছে না ব্রাদার। একটু গোলমাল ঠেকছে।

—হুবহু কীভাবে মিলবে ? এটা কষ্টিপাথরের খোদাই করা মূর্তি, আর ওটা হলো সত্যিকার নৃসিংহ। শিল্পীর হাতে কি অবিকল নকল সম্ভব ? একটু আধটু খুঁত থাকবেই।

পরমেশবাবু এতক্ষণে বলে উঠলেন—মিঃ আরেগোনা ! ওটা আসলে একটা গরিলা।

আরেগোনা লাফিয়ে উঠে বলল—আলবাৎ তাই ! আমি মালয়েশিয়ার বাসিন্দা। আমি জানি, আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগেও মালয়ের জঙ্গলে গরিলা ছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপেও ছিল। ব্রাদার বনবিহারী ! তাহলে এবার তৈরী হও। তুমি আমাকে প্রতারণা করে পাঁচ লাখ ডলার হাত তে চেয়েছ – এ তো কম অপরাধ নয়।

আমার বুক কাঁপল। হতভাগা বনবিহারীর কী পরিণতি ঘটবে কে জানে !

বনবিহারী গ্রাহ্য করল না। ফুঁসে উঠে বলল—ভুল বলছেন পরমেশবাবু !

—উনি কিস্যু জানেন না ! আলবাৎ এটা নৃসিংহ।

আরেগোনা বলল—বেশ। ধরে নিচ্ছি, এটা নৃসিংহ। কিন্তু তোমার ওই মূর্তির গায়ে ওগুলো সাংকেতিক ভাষায় লেখা ফরমুলা, তার প্রমাণ কী ?

—প্রমাণ ? এই দ্বীপে নৃসিংহ স্বচক্ষে দেখেও প্রমাণ চাই ? বনবিহারী কুৎসিত হেসে উঠল।

—বাঃ ! ওই ফরমুলা উদ্ধার করবে কে ?

—আপনাকে তো বলেইছি, ডঃ হরিহর গড়গড়ি ওর পাঠোদ্ধার করতে পারবেন, তাঁকে ধরে নিয়ে আসুন। আমি সাহায্য করব।

আমি শিউরে উঠলুম। লোকটা কী শয়তান!

আরেগোনা বলল—বেশ। ফরমুল্য উদ্ধার হলো। তারপর সেটা কাজে পরিণত করবে কে?

—কেন? ওই তো পরমেশবাবু আছেন। ওকে আটকে রাখুন। উনি মস্তো সার্জন।

পরমেশ রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন—মুখ সামলে কথা বলবে বনবিহারী!

আরেগোনার মুখের ভাব দেখে তার মতলব আঁচ করা কঠিন। কিন্তু সে হেসে উঠল। বলল—বনবিহারী, ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি। আমার সঙ্গে ধূর্তামি করে পার পাবে না ব্রাদার। বিশেষ করে আমার এক পুরনো বন্ধু মেজর সাহেবের পাওয়া ফলক চুরি করে আমার সঙ্গে তঞ্চকতা করেছ—তোমার শাস্তি পাওনা হয়েছে। বোঙা! এদিকে আয় তো!

কয়েকটা জ্বলন্ত টর্চের আড়াল থেকে হিংস্র চেহারার একটা লোক সামনে এসে দাঁড়াল।

—এই শয়তানটাকে পুবের পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের খাড়িতে ছুড়ে ফেলে দিবি। এই বদমাস আমাকে হাজার কাজ পণ্ড করে নৃসিংহ দেখাবে বলে, গরিলা দেখিয়ে আমার মাথা খারাপ করেছে। যা—নিয়ে যা!

আমরা চারজনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছি একপাশে। অন্যপাশে টংকু আরেগোনা। সামনে কিছুটা তফাতে বনবিহারী। আর যে সুড়ঙ্গপথে এসেছি, সেখানে চারজোড়া টর্চ জ্বেলে দাঁড়িয়ে আছে আরেগোনার সশস্ত্র লোকেরা।

বোঙা যেই বনবিহারীর দিকে এগিয়েছে, অমনি বনবিহারী বিদঘুটে হেসে বলে উঠল—ওরে খ্যাদা শয়তান! আমায় শাস্তি

দিবি—এত বুকের পাটা তোর ?

তারপর এক ধুন্ধুমার ঘটে গেল আচম্বিতে।

প্রচণ্ড আওয়াজে গর্তের মধ্যে যেন বোমা ফাটল। তারপরই জন্তুটার ভয়ঙ্কর গর্জন শোনা গেল। কটু বারুদের গন্ধে নিঃশ্বাস আটকে গেল। জানলুম, বনবিহারী গ্রেনেড ছুড়ছে বারবার।

তারপর কর্নেলের চিৎকার শুনলাম—এদিকে! এদিকে!

মনে হলো কর্নেল আমাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিয়ে এলেন। আবার কর্নেলের গলা শুনলুম—এই পথে চলে এস! আমাকে ছুঁয়ে থাকো সবাই!

একটু পরে বুঝলুম, স্তুপুরের সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে আমরা দৌড়ে যাচ্ছি। কর্নেল পিছন থেকে আমাদের ঠেলে নিয়ে চলেছেন।

পিছনে সেই গর্তের মধ্যে মুহূর্মুহু বোমা ফাটার আওয়াজ আর গরিলাটার হুংকার শোনা যাচ্ছে।

*　　　*　　　*

নারকেল বনের শেষে বালির বীচে গিয়ে কর্নেল বললেন—সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। সন্ধ্যায় আমরা আলো জেলে সাংকেতিক চিহ্ন দেখালে শার্ক থেকে বোট আসবে। ততক্ষণ ওপাশে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকি।

রহস্যময় টোরাদ্বীপের মাথার দিকে ঘন জঙ্গল শেষ বেলার রোদে ম্লান দেখাচ্ছে। ধোঁয়া উড়তেও দেখলুম। কী পোড়াচ্ছে ওরা? বনবিহারী, না আরেগোনার মড়া? নাকি গরিলাটার?

আমি মনে মনে কামনা করলুম—ওই বদমাসগুলো মারা পড়ুক। কিন্তু গরিলাটা যেন বেঁচে থাকে।

কৃতান্তবাবুর কাঁকুলে যাত্রা

·· বাস থেকে নেমে একটু অস্বস্তি হচ্ছিল কৃতান্তবাবুর। ভুল জায়গায় নামিয়ে দেয়নি তো কণ্ডাক্টার? পাকারাস্তার দুধারেই ধু ধু মাঠ। দিগন্তে ধোঁয়ার মতো যা দেখা যাচ্ছে, তা নিশ্চয় গ্রাম। কিন্তু এই প্রখর রোদ্দুরে পায়ে হেঁটে সেখানে পৌঁছতে শরীরের আদ্ধেক রক্ত ঘাম হয়ে বেরিয়ে যাবে যে!

হ্যাঁ, ঘাম হয়ে। শরীরের রক্তই যে ঘাম হয়ে বেরোয়, তাতে কৃতান্তবাবুর এখন আর কোন সন্দেহ নেই। এই ধু ধু মাঠ, লোক নেই, জন নেই, গাছ নেই, পালা নেই, যাকে তেপান্তর বলা হয় রূপকথায়—সেখানে দাঁড়িয়ে ঠিক এমন কথাই মনে হবে মানুষের।

বৈকুণ্ঠবাবুকে না জানিয়ে এভাবে হুট করে এসে পড়াটা ভাল হয় নি। জানিয়ে এলে তিনি পাকারাস্তার মোড়ে গাড়ি-টাড়ি নিশ্চয় রাখতেন। বৈকুণ্ঠ পয়সাওলা মানুষ।

পরক্ষণে কৃতান্ত মোড়ের কাঁচা রাস্তাটা দেখে ভাবলেন—হ্যাঁ, গাড়ি ঠিকই রাখত বৈকুণ্ঠ। তবে নির্ঘাত সেটা গরু বা মোষের গাড়ি। অবশ্য ওর জিপ থাকাও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু যে কিপটে মানুষ, রিটায়ার করার পর দেশের বাড়ি গিয়ে জিপ কিনবে? তাহলেই হয়েছে।

ক'মাস আগে কলকাতায় দেখা হয়েছিল দুই বন্ধুর। দুজনেরই বয়স হয়েছে। চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন। কৃতান্ত থাকেন বড়ছেলের কাছে। বৈকুণ্ঠ গ্রামে পৈতৃক ভিটেয় গিয়ে উঠেছেন। কিছু জমিজমাও আছে। ছেলেপুলে নেই, আছে এক ভাগ্নে। সেই এতদিন সব দেখাশোনা করছিল। এখন মামাভাগ্নে মিলে নাকি উন্নত প্রথায় চাষবাস করছেন। কথায়-কথায় বৈকুণ্ঠ বলেছিলেন—

মন খারাপ করলে সোজা চলে যেও ভাই কেতো। কীভাবে যেতে হবে, বলে দিচ্ছি।

পথ ঠিকই বাতলে দিয়েছিলেন বৈকুণ্ঠ। ওই তো কাঁচা রাস্তা মাঠের বুকে সোজা চলে গেছে—ওই রাস্তায় তিন মাইল গেলেই বৈকুণ্ঠের গ্রাম কাঁকুলিয়া। কিন্তু বৈকুণ্ঠ সবই বলেছিলেন, শুধু বলেন নি মাঠটা অবিকল রূপকথার সেই তেপান্তর—আর এই এলাকার আকাশে সূর্যদেবও বেজায় রাগী! বাপস! সবে তো দশটা বেজেছে, এরই মধ্যে মেজাজ কী তিরিক্ষি। কটমট করে তাকাচ্ছেন কৃতান্তের দিকে। রোস্ট করে খেয়ে ফেলবেন একেবারে।

তাও তো রূপকথার তেপান্তরে একটা মস্তো গাছ ছিল শুনেছেন ছেলেবেলায়—যে গাছের ডালে বাস করত ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমী।

কিন্তু এ যেন মরুভূমি। ঢেউ খেলানো ধু ধু মাঠ রুক্ষ নীরস হয়ে পড়ে আছে। হুঁ! সব গুল বৈকুণ্ঠের। চাষবাস না হাতি! এই পাথুরে মাটিতে এক চিলতে ঘাস পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে নি, শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছে—আর কিনা ওঁরা মামা-ভাগ্নে নাকি ফসল ফলিয়ে মা-লক্ষ্মীর বরপুত্র হয়ে গেছেন? ধুর, ধুর! বয়স হয়েও বৈকুণ্ঠ এমন মিথ্যুক, ভাবা যায় না।

কৃতান্তবাবুর রাগ হচ্ছিল। কিন্তু এসে যখন পড়েছেন, এবং বুড়োমানুষ হলেও এখনও শরীরে যুবকের মতো শক্তি আছে বই কি, তখন বৈকুণ্ঠের মুখোমুখি হয়ে ঝাল না ঝেড়ে ছাড়বেন না।

অতএব কৃতান্ত মাথায় রুমাল জড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। রুমাল না জড়ালে সূর্যদেবের দাঁতের কামড় খেয়ে প্রকাণ্ড টাকের অবস্থাটা ভারি কাহিল হয়ে যাবে। কাঁধে একটা ব্যাগ ছাড়া আর কোন বোঝা নেই। সেই রক্ষে।

সত্যি বলতে কী, এই যে এমন করে বৈকুণ্ঠবাবুর বাড়ি যাচ্ছেন, তার কারণ গত রাত থেকে তাঁর মন খারাপ। বৈকুণ্ঠ বলেছিলেন—মন খারাপ হলেই চলে যেও। আনন্দ পাবে।

মন খারাপের কারণ আর কিছুই না, চা। নেপাল নামে যে ছোকরাটিকে বউমা সম্প্রতি বাসায় বহাল করেছে, সে চোরের ওস্তাদ। তিরিশ টাকা কিলোর চা কিনতে গিয়ে পনের টাকা কিলোর চা এনে দেবে এবং তিরিশ টাকা দরেই হিসেব দেখাবে। আর সেই চা কুকুরও ছোঁয় না! কৃতান্তবাবুর বরাবর এই এক অভ্যাস। ভাল এবং দামী চা খাওয়া তাঁর শখ ছিল। এখন নিজে চা কিনতে যান না। তার মানে, ছেলে কিংবা বউমা তাঁকে চা কিনতে যেতে দেন না। ওদের সম্মান যাবে নাকি!

আসলে নেপাল ওদের মাথাটি খেয়েছে। গত রাতে পার্ক থেকে বেরিয়ে এসে অভ্যাসমতো চা চাইলেন। চা ঠিকই এল। কিন্তু সে কি চা, না শুকনো কচুরিপানা সেদ্ধ জল?

নেপালকে বকাবকি করতে গেলে উলটে বউমা তার হয়ে সাফাই গেয়ে বলল কিনা—আজকাল চায়ে বেজায় ভেজাল দিচ্ছে যে! নেপু কী করবে?

নেপাল হল নেপু! ন্যাপলা নয়, আদর করে 'নে-পু!' কোন মানে হয়?

বেশ, নেপু নিয়ে তোমরা ভেঁপু বাজাও। আমি চললুম যেদিকে দুচোখ যায়।

কৃতান্তবাবু অবশ্য টেবিলে একটা চিরকুট সবার চোখে পড়ার মতো জায়গায় রেখে এসেছেন। তাতে লিখে রেখেছেন: 'আমাকে বৃথা খুঁজিও না। পাইবে না।'

বাস থেকে কাঁকুলিয়া রাস্তার এই মোড়ে নেমে একটু পস্তানি অবশ্য হয়েছিল। এতটা করা কি ঠিক হয়েছে? বড় ছেলে প্রতুল কি চুপ করে থাকবে? হাজার হলেও বাবা। বাবা নিরুদ্দেশ হলে ছেলেদের পক্ষে চুপচাপ বসে থাকা অসম্ভব। থানাপুলিস করবে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে। খামোকা হয়রান হবে।

কিন্তু যা করার করে ফেলেছেন, আর পস্তে লাভ নেই। তবে

যদি প্রতুল তাঁর খোঁজ পেয়ে যায় এবং মুখোমুখি এসে পড়ে, কৃতান্ত বলবেন—হ্যাঁ, ফিরে যাব একটা শর্তে। ওই ন্যাপলাকে তাড়াতে হবে।

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে-ভাবতে কৃতান্তবাবু চলেছেন।

একটা সুবিধে, ফাঁকা মাঠ বলে হু হু করে বাতাস বইছে। তাই রোদ্দুরটা খুব একটা কষ্ট দিচ্ছে না।

কিন্তু রাস্তা যেমন এবড়ো-খেবড়ো, তেমনি ধুলোয় ভরা। হাঁটু অব্দি ধুলোয় সাদা হয়ে যাচ্ছে। একদমে এতখানি হাঁটা অভ্যেস নেই বলে ক্লান্তিও আসছে।

বৈকুণ্ঠের দেশের লোকেরা এমন গবেট যে রাস্তার ধারে একটা গাছও লাগায় নি। একেই বলে পাণ্ডববর্জিত দেশ। আর সরকারী সড়ক দফতরই বা কী করছে? প্রতি বছর ওই যে বৃক্ষরোপণ উৎসব হয়, কত ধুমধাম শুনতে পাওয়া যায়, সে সব কি কাঁকুলিয়া এলাকায় হয় না? আসলে তদ্বিরের লোক নেই এখানে। সরকার তো অন্তর্যামী ভগবান নন। গিয়ে সব জানাতে হবে তবে না! ছ্যা, ছ্যা, বৈকুণ্ঠের দেশের লোকেরা এখনও সেই মান্ধাতার আমলে পড়ে আছে।

কৃতান্ত তেতো মুখে এসব কথা ভাবছেন, এমন সময় আচমকা পেছনে আবছা শব্দ শুনতে পেলেন—টং লং! টং লং! টং···লং!

তারপর ঘুরে দেখেন, একটা ঘোড়ার গাড়ি ছুটে আসছে ধুলো উড়িয়ে। সেই গাড়িরই ঘণ্টা বাজছে টং লং · টং লং···টং লং!

ঘোড়ার গাড়িটা দেখা মাত্র রাস্তার ধারে সরে গেলেন কৃতান্ত। মনে ক্ষীণ আশা হল, গাড়িটা থামিয়ে বলবেন নাকি, একটা লিফট্ দিতে?

ঘোড়ার গাড়িটা যত কাছে আসছে, কৃতান্তবাবু কিন্তু তত অবাক্। একালে এমন অখদ্দে পাড়াগাঁয়ে ঘোড়ার গাড়ি কেন, পালকি থাকাও স্বাভাবিক। কিন্তু এই গাড়িটা একেবারে রাজকীয়! সোনার

মতো ঝকমক করছে। কী অপূর্ব নকশা! ঘোড়াছুটোও প্রকাণ্ড এবং সাদা রঙের। তাদের সাজও দেখবার মতো। কোচোয়ানের দিকে তাকিয়ে কৃতান্ত আরও অবাক্ হলেন। জরি আর মখমলের পোশাক, মাথায় বিচিত্র উষ্ণীষ—থিয়েটার যাত্রা বা সিনেমায় ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক চরিত্রে এমন পোশাক থাকে!

কৃতান্ত এত অবাক্ হয়েছিলেন যে গাড়িটাকে হাত তুলে থামাবার কথাই ভুলে গেছেন।

কিন্তু গাড়িটা আচমকা তাঁর কাছে এসেই থেমে গেল। সাদা ঘোড়াছুটো সামনের দুই পা শূন্যে তুলে বিকট চিঁহি করে উঠল।

যাকে কোচোয়ান ভেবেছিলেন, সে যে কোচোয়ান নয়—বুঝতে দেরি হলো না কৃতান্তের। কী সুন্দর বীরোচিত চেহারা! কী উজ্জ্বল গৌর গায়ের রঙ! আবার কোমরে খাপেভরা তলোয়ারও ঝুলছে!

কৃতান্ত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

এই মহাকাশযুগেও বৈকুণ্ঠবাবুর দেশের বড়লোকেরা এমন ঝলমলে সেকেলে পোশাক পরে কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে বেড়ায়, ভাবলে অবাক্ লাগে না?

বোঝা যাচ্ছে, যেকারণেই হোক, কাঁকুলিয়া এলাকা এখনও সেই ঐতিহাসিক রাজ-রাজড়ার যুগেই পড়ে আছে। একে ঘোড়ার গাড়ি বলা উচিত নয়। এই তো অশ্বচালিত রথ!

কৃতান্তের শেষ অব্দি ভালই লাগল ব্যাপারটা। কথায় কথায় লোকে আপশোস করে বলে না হায় রে সেকাল? কৃতান্তবাবুও কতবার বলেন কথাটা। অতএব, বৈকুণ্ঠবাবুর দেশে সত্যিসত্যি জলজ্যান্ত সেকাল যদি টিঁকেই থাকে, সে তো খাসা! আহা, সেকালে মানুষের নাকি কত আনন্দ, সুখসুবিধে ছিল! পুকুরভরা মাছ, গোলাভরা ধান, গামলা-গামলা দুধ! এ সেই কিরপারাম গয়লার নরদমার জল মেশানো দুধ নয়, হরিণঘাটার বোতলের সর তুলে নেওয়া সাদা তরল পদার্থও নয়—খাঁটি দুধ।

আর ঘি? নির্ভেজাল প্রকৃত ঘৃত। কৃতান্তের নোলায় জল এসে গেল। হায় রে! কতকাল প্রকৃত ঘৃতপক্ক লুচি আর খেতে পাওয়া যায় না। কৃতান্ত দীর্ঘশ্বাস না ফেলেও পারলেন না।

এবং মনে মনে আনন্দে নেচেও উঠলেন। বৈকুণ্ঠের বাড়ি প্রকৃত ঘৃতপক্ক লুচির কথা ভেবেই।

এদিকে অশ্বচালিত রথে বসে রাজপুরুষটিও তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। ঠোঁটের কোনায় মৃদু হাসি।

কৃতান্ত সৌজন্য দেখিয়ে করযোড়ে নমস্কার করলেন।

তখন রাজপুরুষ নমস্কার করে সংস্কৃত ভাষায় তাঁকে বললেন—আর্য! ত্বাম্ অভিনন্দতে। কঃ ত্বম্? কুত্র গচ্ছসি?

এই সেরেছে! কৃতান্তবাবু মুশকিলে পড়ে গেলেন। সেই পঞ্চাশ বছর আগে ম্যাট্রিকে সংস্কৃত পড়েছেন। তার কি মনে আছে কিছু? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণ কৌমুদীখানা হাতের কাছে থাকলে বরং চেষ্টা করা যেত।

রাজপুরুষটি মনে হচ্ছে খুবই ভদ্র। মুখের হাসিটি দেখে সেটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু শাস্ত্রে আছে না? শৃঙ্গী প্রাণী আর অস্ত্রধারী মনুষ্য থেকে শত হস্ত দূরে থাকা উচিত। বলা যায় না, কখন কিসে মেজাজ চড়ে যায়।

কৃতান্তবাবু ঘাবড়ে গিয়ে—না, সংস্কৃত নয়—একবারে ইংরেজিতে বলে ফেললেন—স্যার, আই অ্যাম কামিং ফ্রম ক্যালকাটা অ্যাণ্ড গোয়িং টু বৈকুণ্ঠবাবুস হাউস। বাট স্যার, ভেরি হট ডে। ভেরি টায়ার্ড স্যার! ওল্ড ম্যান স্যার···

রাজপুরুষ হো হো করে হেসে ফেললেন। এবার বিশুদ্ধ বাংলায়—তার মানে সাধুভাষায় বলে উঠলেন—বুঝিয়াছি মহাশয়! বুঝিতে পারিয়াছি। থাউক। ইঙ্গরাজী ভাষায় কথোপকথনের আবশ্যকতা নাই। আপনি স্বচ্ছন্দে বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতে পারেন। তবে তাহার আগে আপনি আমার রথে আরোহণ করুন।

পশ্চাৎ যাহা কহিবার কহিবেন।

কৃতান্তবাবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এবং সাবধানে ময়ুরপঙ্খী রথের পেছনদিকের পাদানি দিয়ে অনেক কষ্টে চড়ে বসলেন। রাজ-পুরুষ তাঁর হাত ধরে পাশে বসিয়ে মৃদু হেসে ফের বললেন—মনে হইতেছে আপনি ক্ষুধার্ত এবং যৎপরোনাস্তি ক্লান্ত। চিন্তা করিবেন না। আমার প্রাসাদে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিবেন।

কৃতান্ত খুশী হয়ে বললেন—আপনার প্রাসাদে আতিথ্যের আমন্ত্রণ আমি কি প্রত্যাখ্যান করিতে পারি? কিন্তু হে ভদ্র! সেখান হইতে কাংকুলিয়া পল্লী কতদুর, বলিতে পারেন কি?

কাঁকুলিয়া সাধুভাষায় কাংকুলিয়া হওয়াই উচিত বলে মনে করলেন কৃতান্ত। রাজপুরুষ তাঁর কথা শুনে বললেন—কাংকুলিয়া? ওহো! বুঝিয়াছি—কংকালিকার কথা বলিতেছেন।

কৃতান্ত বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কংকালিয়াই বটে।

—কংকালিকা আমার পিতার রাজধানী। আপনি কাহার নিকট যাইবেন?

—আজ্ঞে, বৈকুণ্ঠ। তিনি আমার সুহৃদ বটেন!

—বৈকুণ্ঠ! অহো, বুঝিয়াছি! শ্রেষ্ঠীপ্রবর বৈকুণ্ঠের নাম এরাজ্যে কে না জানে!...বলে রথের অশ্বকে কশাঘাত করলেন রাজপুরুষ।

রথ চলতে থাকল। ক্রমশঃ গতি বাড়ছিল। কিন্তু এতটুকু ঝাঁকুনি নেই! অদ্ভুত রথ বানাতে পারে এরা—ইতিহাসের দেশের লোকেরা। কৃতান্ত মনে মনে তারিফ করছিলেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠকে শ্রেষ্ঠীপ্রবর বলছেন কেন যুবরাজ? শ্রেষ্ঠী মানে তো বণিক বা ব্যবসায়ী। বৈকুণ্ঠ কি তাহলে এখন চুটিয়ে ব্যবসা করতে নেমেছে?

দেখতে দেখতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দিগন্তের সেই ধোঁয়াটে ব্যাপারটা অর্থাৎ গ্রাম এসে পড়ল। কিন্তু গ্রাম বলা কি ঠিক

হচ্ছে? গাছপালার ফাঁকে সাদা হলদে নীল রঙবেরঙের পাকা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। এ যে রীতিমতো শহর!

কিন্তু না—ইলেকট্রিক লাইন নেই। আকাশ পরিষ্কার। ঘর-বাড়িগুলোর গড়নও ছবিতে যেমনটি দেখা যায় তেমনি। আর ওই বুঝি রাজপ্রাসাদ! বিশাল তোরণ। সশস্ত্র প্রহরী। ওরে বাবা! কী পেল্লায় দানোর মতো ওদের চেহারা! মস্তো বল্লম কাঁধে। কোমরে চ্যাপটা খাঁড়ার মতো অদ্ভুত তলোয়ার ঝুলছে। মাথায় লোহার টুপি। ওদিকে উঁচুতে ফটকের মাথায় একদল প্রহরীর হাতে তীর-ধনুকও রয়েছে। ভুল করে শত্রু ভেবে তীর ছুঁড়লেই হয়েছে! কৃতান্ত ভয়ে চোখ বুজলেন।

ফের যখন চোখ খুললেন, দেখলেন বিশাল এক প্রাঙ্গণে রথ ঢুকছে। প্রাঙ্গণে কত ফুলের গাছ, মর্মরমূর্তি, ফোয়ারা।

চওড়া মস্তো সিঁড়ি—উঁচু, সোপান বলাই উচিত, তার ধারে রথ থামলে একদল পরিচারক আর সশস্ত্র প্রহরী এসে অভিবাদন জানিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়াল।

যুবরাজ কৃতান্তের একটা হাত ধরে বললেন—আর্য! গাত্রোত্থান করুন।

কৃতান্ত সাবধানে নামলেন।

সিঁড়ির ওপরদিকে চওড়া বারান্দার মতো জায়গায় বীণা বাজিয়ে কারা গান জুড়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে। গানের ভাষা সংস্কৃত। মলোচ্ছাই! এত সংস্কৃতের মধ্যে বাংলা নিয়ে বিপদে পড়তে হবে যে! হিন্দি হলে ততটা অসুবিধে ছিল না। আজকালকার হিন্দি তো হ্যায় ট্যায় এসব ক্রিয়াপদ বাদ দিলে খাঁটি সংস্কৃত। এদিকে বাংলার ক্রিয়াপদ বাদ দিলে তো স্রেফ ইংরিজি। এই যেমন—'আমি হাংগ্রি ফিল করছি!'

কৃতান্ত সিঁড়িতে পা বাড়ালে বীণাবাদক আর বীণাবাদিকা মিলে জনা পনের পুরুষ ও স্ত্রীলোক দুধারে দাঁড়িয়ে গান করতে লাগল।

কৃতান্ত যুবরাজের পাশাপাশি সপ্রতিভ ভঙ্গীতে অর্থাৎ কিনা স্মার্ট হয়ে, রাষ্ট্রনেতারা যেভাবে গার্ড অফ অনার ভিজিট করেন, সেইভাবে উঠে গেলেন।

সামনে কারুকার্যময় সুদৃশ্য দরজার পর্দা ছদিকে টেনে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ছজন পরিচারিকা। আর ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন পরিচারক—তার হাতে বিশাল রূপোর রেকাব, তার ওপর সোনার গেলাসে সম্ভবতঃ সুশীতল সরবত-টরবত হবে। দেখা-মাত্র তৃষ্ণা বেড়ে গেল কৃতান্তবাবুর।

কিন্তু তারপরই থমকে দাঁড়ালেন।

সুশীতল পানীয় নিয়ে যে পরিচারক দাঁড়িয়ে আছে, সে আর কেউ নয়—স্বয়ং নেপাল। সেই গ্যাপলা! বউমার আদরের নেপু! নেপু না বলে নেপো বলাই ভাল। যে নেপো দই মারে। কিন্তু অসম্ভব! একই চেহারার লোক তো থাকে। এও তাই। কৃতান্ত-বাবু হাত বাড়ালেন। প্রচণ্ড তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে।

কিন্তু সরবতের গেলাস নিতে গিয়ে দেখলেন, হ্যাঁ—এ ব্যাটা সেই গ্যাপলাই বটে, ফিক করে হাসল। তাবপর ফিসফিস করে বলে উঠল—কত্তাবাবু, ভাল আছেন!

অমনি ঝনঝন করে হাতের গেলাস মেঝেয় পড়ে গেল। যুবরাজ অবাক্। পরিচারক-পরিচারিকারা অবাক্। কৃতান্ত গর্জন করে বললেন—গ্যাপলা! তুই এখানে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ কত্তাবাবু।

কৃতান্ত রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—গেট আউট! গেট আউট!

বলেন আর না বলেন! কাল রাত্তিরে চায়ের নামে শুকনো কচুরিপানার শেকড়সেদ্ধ জল ফুটিয়ে খাইয়েছিল। এখন এই কংকালিকা রাজপ্রাসাদে শরবতের নামে নির্ঘাত নরদমার জল এনেছে। স্বভাব যাবে কোথায়? আসল শরবতটুকু খেয়ে ফেলেছে

যুবরাজ বললেন—কী হইল আর্য? খুলিয়া বলিবেন কি?

ব্যাটা। এ ভেজাল মাল।

কৃতান্তের তাড়া খেয়ে যথারীতি নেপাল গ্রাহ্যই করল না—সে মুচকি মুচকি হাসতে থাকল। যুবরাজ বললেন—কী হইল আর্য? খুলিয়া বলিবেন কি?

কৃতান্ত হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—এই দুর্বৃত্ত দুর্জন দুঃশীল ছোকরাকে এখনই বিদায় করুন যুবরাজ! এ ব্যাটা ভেজালরাজের গুপ্তচর।

অমনি যুবরাজ ফুঁসে উঠলেন—কী! ভেজালরাজের গুপ্তচর? আমার প্রাসাদে? সর্বনাশ! ভেজালরাজ ঝুনঝুনওয়ালা গুলঞ্চপ্রসাদ যে আমাদের শত্রু! এই কে আছ! ইহাকে বন্দী করো!

দুজন কালান্তক চেহারার প্রহরী এসে নেপালকে ধরে ফেলল। নেপাল তাও মুচকি মুচকি হাসে যে! কৃতান্ত চেঁচিয়ে উঠলেন—আবার হাসি হইতেছে? যুবরাজ! দেখিতে পাইতেছেন কি দুর্বৃত্ত এখনও অম্লানবদনে হাসিতেছে?

যুবরাজ আরও রেগে হুকুম দিলেন—ইহাকে এখনই বধ করো। এই মুহূর্তে দুর্বৃত্তের মস্তক ছেদন করো।

ওরে বাবা! সে যে বড্ড রক্তারক্তি কাণ্ড! এখানেই মুণ্ডু কাটবে? কৃতান্ত ঘাবড়ে গেলেন। চোখ বুজে ফেললেন। নেপালটা কী গাড়োল! কেন এখনও ক্ষমা চাইছে না? দেখ দিকি, কী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে! এতখানি হবে, ভাবতে পারেন নি কৃতান্ত।

হঠাৎ তাঁর কানে এল—হ্যাঁ, বউমারই গলা, তাতে কোন ভুল নেই। —কী হইল? কী হইয়াছে? আমার নেপু কী অপরাধ করিয়াছে শুনি?

চোখ খুলেই কৃতান্ত দেখতে পেলেন। বড় বউমাই বটে। কিন্তু এ কী বেশ! এ যে একেবারে রাজ্ঞীর পোশাক পরনে! মাথায় সোনার মুকুট পর্যন্ত! এসে যুবরাজের সামনে হাত মুখ নেড়ে ফের বলে উঠল—নেপু আমার পিতার দেশের ভৃত্য। উহার মস্তক-

ছেদন করিলে আমি এখনই পিত্রালয়ে যাত্রা করিব, বলিয়া দিতেছি —হ্যাঁ।

যুবরাজ বললেন—কিন্তু ও যে ভেজালরাজের গুপ্তচর।

—হাতি! ঘোড়া! তোমার শ্রেষ্ঠীরাই ভেজালরাজের গুপ্তচর! যুবরাজ্ঞীবেশিনী বউমা বলল। এই তো আমি পাকশালা হইতে আসিতেছি। শ্রেষ্ঠীর বিপণি হইতে যে ঘৃত পাঠানো হইয়াছে, উহা ঘৃত নহে, অন্য কোন বস্তু।

বন্দী নেপাল বলল—ডালডাও নহে। জলহস্তীর চর্বি।

যুবরাজ গর্জন করে বললেন—কে আছ? শ্রেষ্ঠীকে বন্দী করিয়া লইয়া আইস।

এবার যুবরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে কৃতান্তবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—প্রতুল! তুই!

—হ্যাঁ পিতা।

—ওরে হতভাগা! এতক্ষণ কহিস নাই কেন? আমি যে তোকে চিনিতে পারি নাই।

বড় ছেলে আর বড় বউমা টিপ করে একসঙ্গে কৃতান্তের পায়ে প্রণাম করতেই সব রাগ জল হয়ে গেল কৃতান্তের। আশীর্বাদ করে বললেন—সুখমস্তু। চিরজীবী হও!

তারপর নেপালও প্রহরীদের হাত ছিটকে বেরিয়ে এসে তাঁর পায়ে একটি প্রণাম ঠুকে বলল—অপরাধ লইবেন না কর্তামহাশয়! আসুন, আপনাকে উৎকৃষ্ট চা পান করাইতেছি।

এইসময় বাইরে ভেরিতূরীকাড়ানাকাড়া বেজে উঠল। একজন দৌবারিক ঘরে ঢুকে প্রণাম করে বলল—মহারাজ! আপনি ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া কংকালিকার প্রজাবৃন্দ আপনার দর্শনপ্রার্থী।

কৃতান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ছ্যা, ছ্যা, এই ধুলোময়লা নোংরা পানজাবি-ধুতি পরে কি প্রজাদের দর্শন দেওয়া যায়? কাঁধের

ঝোলাটা ফেলে দিয়ে বললেন—কে আছ? আমাকে উৎকৃষ্ট রাজবেশ পরাইয়া দাও।

সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড রেকাবে রাজবেশ নিয়ে পরিচারকবৃন্দ এসে দাঁড়াল। নেপাল একগাল হেসে বলল—আমিই মহারাজের মস্তকে মুকুট পরাইব।

ইচ্ছে হয়েছে তো পরাক্ না। নেপাল ছেলেটা তো এমনিতে খারাপ নয়। বড় মধুর মিষ্টি স্বভাব। আসলে ভেজালরাজের চেলারা জিনিসপত্রে ভেজাল দিলে ও বেচারা করবে কী?

বাইরে তুমুল বাদ্য বাজছে। প্রজারা জয়ধ্বনি দিচ্ছে। নেপাল কৃতান্তের মাথায় মুকুট পরিয়ে বলল—এবার সুশীতল জল আনয়ন করি মহারাজ। আপনি তৃষ্ণার্ত।

দেরি হলো না। নেপালচন্দ্র জলভরা সোনার গেলাস রুপোর রেকাবে রেখে সামনে তুলে ধরল। কৃতান্ত তৃষ্ণার্ত। হাত বাড়ালেন। হাতটা হঠাৎ বড্ড ভারী লাগছে। হ্যাঁ, লাগবেই তো। সোনা হীরে মাণিক বসানো রাজপোশাক। ওজন আছে।

বাইরে প্রজারা মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি দিচ্ছে—জয় মহারাজ কৃতান্ত-দেব। তুরীভেরী কাড়ানাকাড়া বাজছে। তারপর কী একটা ঘটল। ঠিক বুঝতে পারলেন না কৃতান্ত। কিন্তু গুরুতর কিছু নিশ্চয় ঘটল।

কারণ কৃতান্তবাবুর মনে হলো আচমকা বুঝি আছাড় খেয়েছেন। খেয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

কোথায় কী! কোথায় কংকালিকা রাজপ্রাসাদ! কোথায় রাজপোশাক, হ্যাপলা, প্রতুল, বউমা, পরিচারক-পরিচারিকা, বীণা-বাদক-বীণাবাদিকা-গায়ক-গায়িকা! কোথায় বা পেল্লায় চেহারার কালান্তক প্রহরীরা!

তবে ধু ধু রোদ্দুরে নয়, ছায়াতেই শুয়ে আছে। গাছটা বটগাছ। ডালে অজস্র পাখি লাল টুকটুকে বটফল ঠোকরাচ্ছে।

আর হ্যাঁ, আকাশের নীচু দিয়েই একটা এরোপ্লেন যাচ্ছে। তুরীভেরী কাড়ানাকাড়া নয়। নিছক এরোপ্লেন।

আর কৃতান্তের পরনে ধুলিধুসর সেই পানজাবি-ধুতি, পায়ের পাম্পশুজোড়া ব্যাগের তলায় রাখা আছে। ব্যাগটা দিব্যি বালিশ করে বটতলার শুকনো ঘাসে শুয়ে আছেন।…

তাহলে নিছক স্বপ্নই দেখছিলেন!

দুঃখে ও রাগে মন খারাপ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কোন মানে হয়? কৃতান্ত উঠে বসে হাই তুললেন। পাকা রাস্তাটা দূরে দেখা যাচ্ছে। হু হু রোদ্দুরে কাচের মতো ঝকঝক করছে।

তাহলে কাঁচা রাস্তায় আনমনে হাঁটতে হাঁটতে কখন এই বটতলায় পৌঁছে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু তেষ্টায় গলা কাঠ। এখনই জল খাওয়া দরকার। কৃতান্ত এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ দেখলেন, বটগাছেরই ডালে কে যেন বসে আছে। আঁতকে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে। কালো কুচকুচে একটা লোক ওখানে বসে কী করছে?

ভূতপ্রেত নয় তো? কিছু বলা যায় না। বৈকুণ্ঠের এই দেশে সবই সম্ভব। কাঁপা-কাঁপা গলায় কৃতান্ত বললেন—কে? কে ওখানে?

ভূত অথবা লোকটা ঘুরে বসল। কালো মুখে সাদা সাদা দাঁত ঝকমক করছে। হাসছে, না ভয় দেখাচ্ছে?

কৃতান্ত ভয় পেয়েছেন বলেই ধমক দিতে পারলেন। —দাঁত বের করছ কেন বাবা? এ্যাঁ? হনুমানের মতো ডালেই বা বসে আছ কেন, শুনি?

না, ভূত নয়। নাকী স্বরে কথা বলল না। লোকটা বলল—আজ্ঞে, পাকা বটফল পাড়ছি।

—বটফল? খায় বুঝি?

—আজ্ঞে, পাখপাখালিতে খায়। আমি একটা পাখি পুষেছি কিনা। তার জন্যে বটফল পাড়ছি।

—তা বেশ করছ। এখানে জল আছে কোথায় বলতে পারো?

—জল? ওই যে ওখানে একটা দীঘি আছে। লোকটা কথা বলতে বলতে নেমে এল গাছ থেকে। এসে করযোড়ে প্রণামও করল।—আপনি শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন দেখলুম। তা কোত্থেকে আসছেন বাবুমশাই? কোথায় যাবেন?

—কলকাতা থেকে। যাব কাঁকুলিয়া।

—কাঁকুলে? সে তো এখনও দুমাইলটাক পথ বাবুমশাই!

—বল কী হে! তা এ জায়গাটার নাম কী?

—বাজেকাঁকুলে আজ্ঞে।

—বাজেকাঁকুলে! সে আবার কী হে?

—আজ্ঞে বাবুমশাই, শুনেছি—কোন আমলে নাকি এখানেই আসল গেরামটা ছিল। এখন জঙ্গল হয়ে গেছে। লোকে বলে বাজেকাঁকুলে।

কৃতান্ত উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—তোমার বাড়ি কোথায়?

লোকটা জবাব দিল—আমার বাড়ি আজ্ঞে কাঁকুলের পাশে আঁচুলে।

কী অদ্ভুত নাম সব! কাঁকুলে আঁচুলে। ধুঁচুলে নামেও হয়তো গ্রাম আছে, বলা যায় না। কৃতান্ত মনে মনে হেসে বললেন—ওহে! আমাকে দীঘিটা দেখিয়ে দিয়ে এস তো!

অমনি লোকটা হাত যোড় করে বলল—ক্ষেমা করবেন বাবুমশাই! আমি যেতে পারব না। ওই তো দেখা যাচ্ছে উঁচু পাড়—আপনি চলে যান। খুব ভাল জল আছে। টলটলে কালো জল। ঘাটও পাবেন।

কৃতান্ত একটু অবাক হয়ে বললেন—কেন যেতে পারবে না?

লোকটা জবাব না দিয়ে আবার বটগাছে গিয়ে উঠল। অদ্ভুত
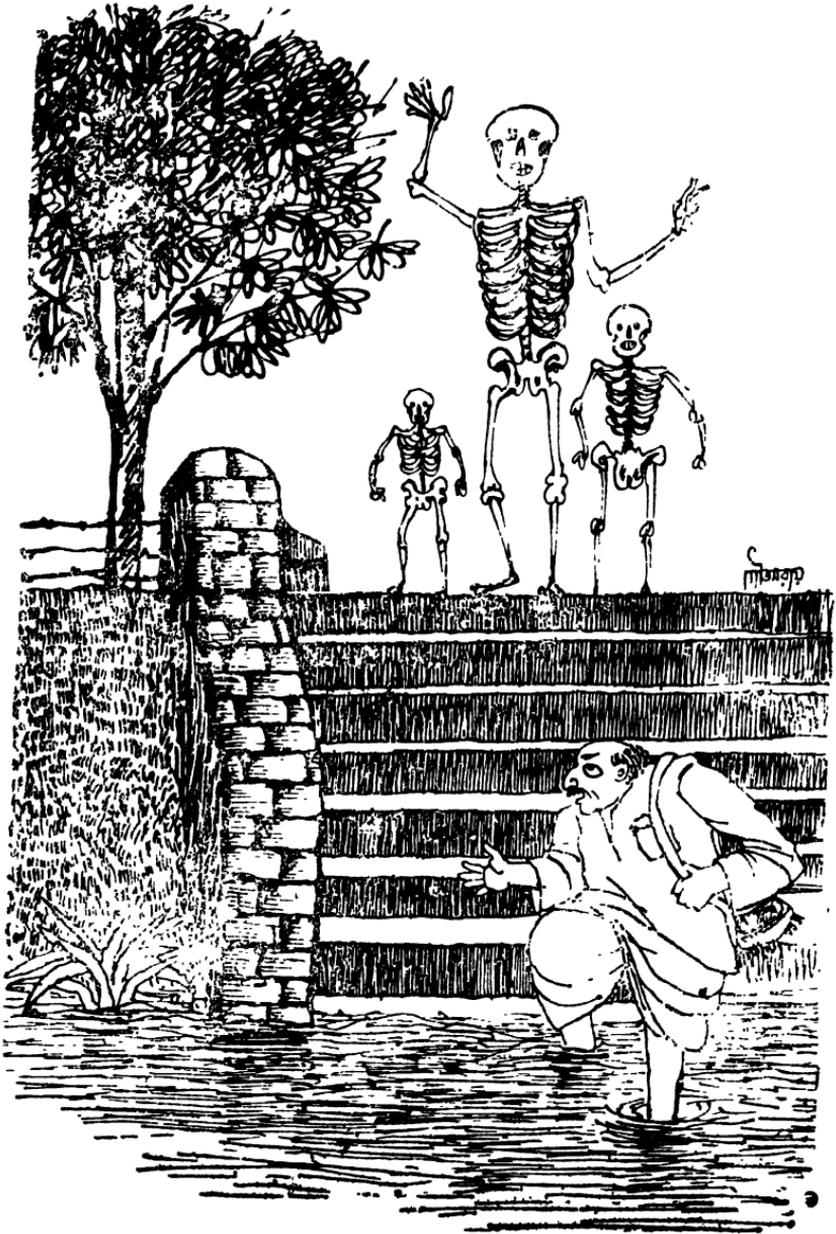
ঘাটের মাথায় সার-সার দাঁড়িয়ে আছে তিন-তিনটে কঙ্কাল

লোক তো! বৈকুণ্ঠের দেশের লোক কিনা! এমনিই তো হবে। মনে মনে গজগজ করতে করতে কৃতান্তবাবু দীঘির পাড় লক্ষ্য করে এগিয়ে চললেন।

ক্ষয়াখর্বুটে ঝোপঝাড় গাছপালার জঙ্গল পেরিয়ে পাড়ে উঠে দেখলেন, প্রচুর ভাঙ্গাচোরা ঘরবাড়ি আর তার মধ্যে আগাছা গজিয়ে রয়েছে। ঘাটটাও পাথরে বাঁধানো। ধাপগুলো ভাঙাচোরা। শ্যাওলা জমে আছে। বিশাল দীঘিটা দামে ভরতি। তাহলে কি এখানে ঐতিহাসিক যুগে একসময় সত্যিসত্যি রাজপ্রাসাদ ছিল?

সে পরে হবে। আপাততঃ জল তেষ্টা মেটানো যাক্। সত্যি, জলটা যাকে বলে কাজলবর্ণ। স্বচ্ছ। আঁজলায় জল তুলে প্রাণভরে পান করলেন কৃতান্ত। সূর্য এখন একটু ঢলেছে। হাত ঘড়িতে বেলা দেড়টা বাজে।

জল খেয়ে মুখ কাঁধ হাত পা রগড়ে ধুলেন কৃতান্ত। আঃ! কী আরাম! বরং আরও কিছুক্ষণ ওই বটতলায় বিশ্রাম করে রোদের তেজ কমলে বৈকুণ্ঠের গ্রামের দিকে রওনা হবেন।

আরামে নিশ্বাস ফেলে কৃতান্ত ঘুরে সিঁড়ির ধাপে পা ফেলেছেন, সেই সময় দুপ-দাপ শব্দ হল সিঁড়ির ওপর দিকে। তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন কৃতান্ত।

রাত হলে কিছু বলার ছিল না। এ যে একেবারে দিনদুপুর। উজ্জ্বল রোদ্দুর।

তাছাড়া, তখন না হয় ঘুমোচ্ছিলেন বটতলায়। তাই স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু এখন? এখন তো স্বপ্ন নয়। তাহলে?

ঘাটের মাথায় সার-সার দাঁড়িয়ে আছে তিন-তিনটে কঙ্কাল।

হ্যাঁ, পুরোদস্তুর কঙ্কাল।

তারপর তারা চেরা গলায় অমানুষিক চেঁচিয়ে উঠল—পেঁয়েছি! পেঁয়েছি! পেঁয়েছি!

তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কৃতান্তের ওপর।

কৃতান্ত টের পেলেন তাঁকে অসম্ভব ঠাণ্ডা হাড়ের হাতে ধরে চ্যাংদোলা করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অনবরত খট্‌খট্‌ খটাখট্‌ শব্দও শোনা যাচ্ছে।

না—অজ্ঞান হলেন না। অজ্ঞান হওয়ার অভ্যেস নেই কৃতান্তের। ভয় পেলে মানুষের অজ্ঞান হওয়া স্বাভাবিক। কৃতান্ত ভয় পেয়েছেন বললে ভুল বলা হবে। কারণ এ ব্যাপারটাও চরম মুহূর্তে স্বপ্ন বলে মেনে নিয়েছেন। এবং স্বপ্নে মুণ্ডুই কাটা যাক্‌, আর ভূতেই ঘাড় মটকাক্‌, ক্ষতি কী?

বরং এই গরমে ঠাণ্ডা হাড়ের ছোঁয়ায় আরামই লাগল। কৃতান্ত চোখ বুজে থাকলেন। দেখা যাক্‌ না, স্বপ্নটা শেষ অব্দি কোথায় দাঁড়ায়!··

কিন্তু একি সত্যিসত্যি স্বপ্ন?

কঙ্কালগুলো কৃতান্তবাবুকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে একটা ভাঙা ঘরে ঢুকল। তারপর ধুম করে ফেলে দিতেই আছাড় খেলেন কৃতান্ত এবং ব্যথায় ককিয়ে উঠলেন। অতএব এটা স্বপ্ন নয়।

আছাড় খেলেই তো স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার কথা। এতকাল কত ভীষণ সব স্বপ্ন দেখেছেন এবং আছাড়ও খেয়েছেন। তারপর দেখেছেন খাটের নীচে পড়ে গেছেন। ঘুমও ভেঙেছে।

এটা স্বপ্ন নয়। আসলে বৈকুণ্ঠবাবুর কাঁকুলিয়া গ্রামের ব্যাপারটাই এমনি বিদঘুটে। এ এক সৃষ্টিছাড়া দেশ।

কৃতান্ত আছাড় খেয়ে ব্যথায় কাতরে উঠলে কে নাকীস্বরে বলল—লাঁগল নাঁকি ভাঁয়া?

ঘরের দেয়াল ভাঙা, ছাদও ফাটলধরা—তার ফাঁকে যেটুকু আলো আসছে তাতেই কৃতান্ত অবাক্‌ হয়ে দেখলেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা কঙ্কাল।

কঙ্কালের মুখে ভায়া বলা সহ্য করা যায় না। কৃতান্ত দাঁত মুখ

খিঁচিয়ে বললেন—থাক্! আর সিমপ্যাথি দেখাতে হবে না! কে হে তুমি? এমন করে এদের পাঠিয়ে আমাকে জবরদস্তি ধরে আনলে। একি মগের মুল্লুক পেয়েছ নাকি?

কঙ্কালটা হি হি করে হেসে উঠল। তারপর বলল—সেঁ কীঁ ভাঁয়া! আঁমায় চিঁনতে পাঁরছনা? আঁমি বৈঁকুণ্ঠ।

এ্যাঁ! বলে কী ব্যাটাচ্ছেলে ভূত! বৈকুণ্ঠ এখনও দিব্যি বেঁচেবর্তে আছেন। ভাগ্নেকে নিয়ে এগ্রিকালচারাল ফার্ম খুলেছেন। কৃতান্ত হাত তুলে বললেন—থাপ্পড় মারব বলে দিচ্ছি। ইয়ারকির জায়গা পাও নি?

কঙ্কাল আবার হি হি করে হেসে উঠল। বলল—মাঁইরি কেঁতো, তোঁমার দিঁব্যি আঁমি তোঁমার বঁন্ধু সেঁই বোঁকা!

কৃতান্ত গোঁ ধরে বললেন—মুখে বললে তো চলবে না। প্রমাণ চাই।

এদিকে যে তিনটে কঙ্কাল কৃতান্তবাবুকে ধরে এনেছে, তারা এতক্ষণ পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ। এবার তাদের একজন চেঁচিয়ে উঠল—ওঁরে বাঁবা! এঁ যেঁ প্রঁমাণ চাঁইছে!

আরেকজন বলল—তাঁহলে তোঁ মুঁশকিল বেঁধে গেল রেঁ!

তৃতীয়জন বলল—কিঁচ্ছু নাঁ রেঁ! আঁয়, আঁমরা এঁর মাঁথায় গাঁট্টা মাঁরি। তাঁহলে আঁর প্রঁমাণ চাঁইবে নাঁ।

বৈকুণ্ঠবাবুর পরিচয় দিচ্ছিল যে কঙ্কালটা, সে বলল—ওঁহে কেঁতো! এবাঁর মাঁথা বাঁচাও। বলে সে হাড়ের হাতে তালি বাজিয়ে হি হি করে হাসতে লাগল।

তারপরই ভীষণ কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। কৃতান্তবাবু বুড়োমানুষ হলে কী হবে? এখনও গায়ে জোর আছে। যৌবনে দস্তুরমতো ডনবৈঠক ভাঁজতেন। ফুটবলও খেলতেন। বক্সিং জুডো এসবেও অল্পস্বল্প হাত ছিল। ওরা হাড়ের হাতে গাঁট্টা মারতে আসার সঙ্গে সঙ্গে একপ্যাঁচে সবাইকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। একজন তো

উঁ হু হু করে ককিয়ে উঠল।

তারপর কৃতান্ত ধুন্ধুমার যুদ্ধ বাধিয়ে ফেললেন। স্রেফ ঘুঁষির চোটে কঙ্কালগুলোকে কোণঠাসা করে দিলেন। এমন আজব বক্সিং স্বয়ং ক্যাসিয়াস ক্লে ওরফে মহম্মদ আলিরও লড়ার সাধ্য ছিল না।

হ্যাঁ, খটখটে হাড়ে ঘুঁষি মারলে হাত ব্যথা তো করবেই। তাই বলে কৃতান্ত কাবু হবার পাত্র নন।

দেখা গেল, ভূত বা কঙ্কালগুলো বক্সিংয়ে একেবারে আনাড়ি। ভূতের রাজ্যে বক্সিং নেই সম্ভবতঃ। কাতুকুতু আছে। ঘাড় মটকানো আছে। চোখে আঙুল দেওয়া আছে। বক্সিং নিশ্চয় নেই। অবশ্য একটু আধটু জুডো থাকলেও থাকতে পারে।

ঘুঁষির চোটে শেষ অব্দি জানলা-দরজা গলিয়ে চারটে কঙ্কালই পালিয়ে গেল। তারপর হাতব্যথা করতে থাকল কৃতান্তের।

তা করুক। ভূতের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতেছেন এই গর্বে বুক ফুলিয়ে বেরুলেন!

বেরিয়ে দেখেন দীঘির ঘাটের কাছে সেই বটগাছের লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে দেখে সে আগের মতো দাঁত বের করে হাসল।

কৃতান্ত তার কাছে গিয়ে বললেন—হাসি কিসের? এ্যাঁ? তখন খুব তো দীঘি দেখিয়ে দিয়েই হনুমানের মতো গাছে চড়ে বসলে। ব্যাপার কী?

লোকটা চাপা গলায় এবং চোখ নাচিয়ে বলল—ওনাদের দেখা পেলেন নাকি বাবুমশাই? ওনাদের ভয়েই তো আমি আসি নে।

—এখন এলে যে?

—আজ্ঞে, পরে ভেবে দেখলুম আপনি বিদেশী মানুষ। একা-দোকা কোন বিপদে পড়লেন নাকি। তাই এলুম। তা বাবুমশাই, ওনারা কেউ আসে নি?

কৃতান্ত ফের ঘাটে হাত ধুতে নামছিলেন। ছ্যাঃ! কঙ্কালের

গায়ের ছোঁয়া লেগেছে। স্নান করতে পারলেই ভাল হতো। কিন্তু বিদেশবিভুঁয়ে পুকুরের জলে স্নানের অভ্যাস নেই। ঠাণ্ডা লেগে অসুখবিসুখ হতে পারে। তাই হাতদুটো রগড়ে ধোবেন।

হাত ধুতে ধুতে কৃতান্ত লোকটার কথার জবাব দিলেন।—ব্যাটারা এসেছিল হে! বুঝেছ? এলে কী হবে? খুব শিক্ষা দিয়েছি বাছাধনদের। আর ভুলেও এতল্লাটে পা দেবে না। হাড়গোড় ভেঙে দিয়েছি।

লোকটা খুশী হয়ে বলল—ভাল করেছেন আজ্ঞে। খুব ভাল করেছেন।

কৃতান্ত এত কাণ্ডের মধ্যে কাঁধের ব্যাগ কিন্তু ফেলেন নি। তার ভেতর থেকে তোয়ালে বের করে হাত মুছে বললেন—যাক্ গে। তোমার বাড়ি তো বৈকুণ্ঠবাবুদের পাশের গাঁয়ে বলছিলে। চলো তো, আমায় রাস্তা দেখিয়ে দেবে।

—কী বাবু বললেন?

—বৈকুণ্ঠবাবু। কাঁকুলিয়ার বৈকুণ্ঠ তলাপাত্রের নাম শোন নি?

লোকটা চোখ কপালে তুলে বলল—বৈকুণ্ঠবাবু? মানে কাঁকুলের বোকা বাবুর কাছে যাবেন? ও বাবুমশাই, উনি যে গতকাল মারা গেছেন!

—এ্যাঁ! মারা গেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওনার ভাগ্নেবাবুরা কাল সন্ধেবেলা ওই শ্মশানে ওনাকে পুড়িয়ে গেলেন যে!...বলে লোকটা দীঘির অন্যপাড়ে একটা ঝোপ ঝাড় ও শিমুলগাছের দিকে আঙুল তুলল।—ওই যে দেখছেন, ওটাই শ্মশান।

কৃতান্তবাবু আস্তে আস্তে ঘাটে বসে পড়লেন। তাহলে সত্যিসত্যি বৈকুণ্ঠের আত্মা বা ভূত কঙ্কালের রূপ ধরে দেখা দিয়েছিল তখন। তিনি প্রমাণ চেয়ে বসে খামোকা ঝামেলা বাধালেন।

আহা, বেচারা বৈকুণ্ঠকেও এন্তার ঘুঁষি মেরেছেন। না জানি কত ব্যথা সে পেয়েছে! বন্ধুর শোকে এবং তার ভূতের ব্যথা পাওয়ার দুঃখেও বটে, কৃতান্তবাবু কেঁদে ফেললেন।—ওরে বোকা রে! তোকে খামোকা কেন অত ঘুঁষি মারলুম রে!···

লোকটা সহানুভূতি দেখিয়ে বলল—আহা! কাঁদবেন না বাবুমশাই। আমারও কান্না পাচ্ছে যে। কাকেও কাঁদতে দেখলে আমারও কান্না পায়।

তারপর সেও বিকট ভ্যাঁ করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে কৃতান্তবাবু উঠে থাপ্পড় তুলে তার গালে মারলেন। আমার বন্ধু মরেছে এবং ভূত হয়েছে—আমি কাঁদতে পারি। তাই বলে তুই ব্যাটা কাঁদবার কে?

কিন্তু থাপ্পড় মেরেই দেখলেন—এতক্ষণে দেখলেন, যাকে থাপ্পড় মেরেছেন, সে আর কেউ নয়, স্বয়ং নেপাল। তাঁর বউমার আদরের চাকর নেপু!

ব্যাপারটা কী?···

ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়।

থাপ্পড় সত্যি তিনি নেপালচন্দ্রকেই মেরেছেন। তবে সেটা ওর গায়ে লাগে নি। লেগেছে চায়ের কাপে এবং কাপটা উলটে গেছে। ঝনঝন শব্দ হয়েছে। বড় বউমা দৌড়ে এসেছে। নাতিনাতনীরাও এসে পড়েছে।

নেপাল বলল—দিলেন তো চাটা ফেলে। অতভালো চা সেই থেকে নিউমার্কেট খুঁজে আনলুম আপনার জন্যে। কাল সন্ধেবেলা বাজে চা খেয়ে বকাবকি করলেন বলে তক্ষুনি দৌড়েছিলুম নিউ-মার্কেট। ভেবেছিলুম সকালবেলা কর্তাবাবুকে যদি ফাস্টকেলাস চা না খাওয়াতে পারি তো আমার নাম নেপালই নয়।

কৃতান্তবাবু ধুড়মুড় করে উঠে বসলেন।

হ্যাঁ, নিজের ঘরের খাটেই সবকিছু ঘটেছে। তবে আগে এখনই টেবিলে রাখা চিরকুটটা হাতসাফাই করা দরকার। সেই যে লেখা আছে: 'আমাকে বৃথা খুঁজিও না। পাইবে না।' রাতে মনের দুঃখে লিখে রেখেছিলেন। ভোরবেলা কেউ ওঠার আগে কেটে পড়ার মতলব করে শুয়ে পড়েছিলেন। তারপর কত কী ঘটেছে। স্বপ্ন ভেবেছিলেন, কিংবা স্বপ্ন নয় তাও ভেবেছিলেন—এ সবই স্বপ্নের মধ্যে ভাবা।

চিরকুটটা মুঠোয় লুকিয়ে ফেলে কৃতান্ত ছেলেমানুষের মতো হাসলেন। বললেন—কী সব স্বপ্ন! স্বপ্নের মধ্যে হাত ছুড়ে চায়ের কাপ ফেলে দিয়েছি—বুঝলে বউমা?

বউমা হাসি চেপে চলে গেল। নাতিনাতনীরা বলল—কী স্বপ্ন? কী স্বপ্ন দাদুভাই?

কৃতান্ত বললেন—শুধু কি স্বপ্ন? স্বপ্নের ভেতর স্বপ্ন। তার ভেতর স্বপ্ন। আয়নার ভেতর আয়না। তার ভেতর যেমন আয়না। বুঝলে তো?

এই সময় বাইরের ঘরে কে চড়া গলায় বলল—কেতোভায়া, আছ নাকি?

কৃতান্ত আশ্বস্ত হয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন—এস, এস, বৈকুণ্ঠ এস। আজ রাত্রে কী হয়েছে শোন। অদ্ভুত সব স্বপ্ন···

বৈকুণ্ঠ ঘরে ঢুকে বললেন—পরে শুনব ওসব। কই, তুমি তো গেলে না। সন্ধেবেলা কলকাতা এসেছি। এসেই ঠিক করেছিলুম সকালে তোমার বাসায় আসব। তা এত বেলা অব্দি শুয়ে থাকো নাকি আজকাল? বাতে ধরবে যে!

কৃতান্ত হাসতে হাসতে বললেন—আরে, আগে স্বপ্নটাই শোন না। দেখলুম, তুমি মারা গেছ—আর ··

বৈকুণ্ঠবাবু হো হো করে হেসে বললেন—এ তো আমার পক্ষে সুস্বপ্ন! কারুর মারা যাওয়ার স্বপ্ন দেখা মানেই তার আয়ু বাড়ল।

কৃতান্ত হাতের মুঠো দেখছিলেন। কিন্তু ব্যথা করছে কেন? স্বপ্নে ঘুষি মারলে তো ব্যথা লাগা উচিত নয়।

অবশ্য নেপালের চায়ের কাপে হাত ছুড়েছিলেন। কিন্তু তাতে ব্যথা হবার কথাই ওঠে না। তাহলে?

কৃতান্তবাবু উদ্বিগ্ন হলেন। এবার যা দেখছেন, এও আগের স্বপ্নের মধ্যে আরেকটা স্বপ্ন নয় তো? যেমন আয়নার ভেতর আয়না, তার ভেতর আয়না—তার ভেতর আবার আয়না।

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন—কী হলো ভায়া? হাতে কী হলো? ব্যথা নাকি? চলো, আমার সঙ্গে এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ো। আমাদের কাঁকুলিয়ায় ভাল কবরেজ আছেন। চিন্তা নেই।

কৃতান্ত নিস্তেজ ভঙ্গীতে বললেন—ও কিছু না। তারপর আবার দুর্ভাবনায় পড়ে গেলেন। এও যদি স্বপ্ন হয়?

হুঁ, এটা যে স্বপ্ন নয়, তার প্রমাণ কী? আগের স্বপ্নে এই বৈকুণ্ঠের ভূত ঠিক কথাই তো বলেছিল। প্রমাণ ব্যাপারটা সত্যি বড় কঠিন। বিশেষ করে নেপাল এইমাত্র যে ভাল চা এনে দিল দুকাপ, তা সত্যি অপূর্ব বলেই ধাঁধা ঘুচছে না। নেপালের চা তো এত ভাল হয় না।

ও বেশী দামের চা এনেছে বলে আনে কম দামের। পয়সা মারে। তাই এমন ভাল চা যে খাওয়াবে, তা অবিশ্বাস্যই বলা যায়।

কৃতান্ত চা খেতে খেতে বললেন—আচ্ছা বৈকুণ্ঠ, তোমাদের কাঁকুলিয়াকে কি লোকে কাঁকুলে বলে?

বৈকুণ্ঠ বললেন—হ্যাঁ। তুমি কেমন করে জানলে?

—আচ্ছা, একটা বাজেকাঁকুলেও আছে কি?

—আছে। জঙ্গল মতো একটা জায়গা···

—সেখানে একটা দীঘি আছে। ভাঙা পাথুরে ঘাট আছে। দক্ষিণ পাড়ে শ্মশান আছে। পূর্বপাড়ে ভাঙা ঘড়বাড়ি আছে। তাই না?

বৈকুণ্ঠ অবাক হয়ে বললেন—সব ঠিক। কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে ?

কৃতান্ত আরও উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন—কাঁচা রাস্তার মোড়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ আছে।

—আছে বইকি। খুব পুরনো আমলের বটগাছ। পাঁচশো বছর···

—তোমাদের কাঁকুলের পাশে আঁচুলে নামে একটা গ্রাম আছে ?

—হুঁ, আছে। কিন্তু তুমি···

কৃতান্ত সান্দগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন—দেখ বৈকুণ্ঠ, আমার মনে হচ্ছে, কোন গোলমেলে ধাঁধায় আটকে গেছি। স্বপ্নের গোলকধাঁধা বলতে পারো। কিংবা এমনও হতে পারে, আমি আর বেঁচে নেই। পরলোকে চলে এসেছি।

বৈকুণ্ঠ হো হো করে হেসে বললেন—মাথা খারাপ! কী সব আবোল-তাবোল বলছ!

—তাহলে আমায় একটা চিমটি কাটো তো।

বৈকুণ্ঠ বললেন—যাঃ! আমার আঙুলে জোর নেই। তবে কাতুকুতু দিতে পারি। দেব নাকি ?

—তাই দাও দিকি ভায়া!

বৈকুণ্ঠের কাতুকুতু খেয়ে কৃতান্ত হি হি করে হেসে আকুল হলেন। নাঃ আর স্বপ্ন নয়। নিশ্চয়ই নয়। তাহলে ঘুম ভেঙে যেত।

কিন্তু স্বপ্নে সত্যিকার একটা জায়গা দেখলেন—এর রহস্য কী ?

হঠাৎ চোখ গেল বালিশের পাশে রাখা বইটার দিকে। তক্ষুণি বুঝলেন কী ঘটেছে। সব মনে পড়ল। কৃতান্তবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে নড়ে চড়ে বসলেন। বাপ্‌স! জোর বাঁচা গেল।

বুঝলেন বৈকুণ্ঠও। তিনিই বইটা তুলে নিয়ে দেখে বললেন—

তাই বলো! ও'মালি সায়েবের পুরনো জেলা গেজেটিয়ার পড়ছিলে রাত্রে? হুঁ—এই যে! আমাদের এলাকার ঐতিহাসিক বিবরণও আছে দেখছি। পাতা মুড়ে রেখেছ। বুঝলে ভাই কেতো? কাঁকুলে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জায়গা। গুপ্তযুগে একসময় এক রাজার রাজত্ব ছিল। তাঁর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে। পাঁচশো বছরের অক্ষয় বটগাছ আছে। কত কী আছে! দীঘির ধারে শ্মশানটারই বয়স দুশো বছর হয়ে গেল!